বাংলাদেশে উত্তরাধিকার বঞ্চিত হিন্দু নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান

রুমা হালদার
রেজি: নং-১২৭
সেশন-২০০১-২০০২

এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

436749

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"বাংলাদেশে উত্তরাধিকার বঞ্চিত হিন্দু নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান"** শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে, এই শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেনি। এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

রুমা হালদার

রুমা হালদার

রেজি নং ১২৭, সেশন ২০০১-২০০২

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

436749

Dhaka University Library

436749

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, রুমা হালদার কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য রচিত **"বাংলাদেশে উত্তরাধিকার বঞ্চিত হিন্দু নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানোত্তর এককভাবে সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানামতে, এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

৭/১/০৮

অধ্যাপক ড. তাসনিম আরেফা সিদ্দিকী
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

43674

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

মা - কে

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

আধুনিকতার এই স্বর্ণযুগে বিশ্বব্যাপী যখন নারীরা জোড় কদমে এগিয়ে যাচ্ছে, সর্বত্র ক্ষমতায়নের জোয়ার বইছে তখন বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নারীরা এখনও অনেক পিছিয়ে রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষ রাজনৈতিক পদগুলোতে নারীর আধিক্য থাকলেও গোটা নারী সমাজের ক্ষেত্রে চিত্রটি একেবারেই ভিন্ন। পিছিয়ে পড়া এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীর অবস্থা আরও নাজুক। বিশেষ করে বাংলাদেশে হিন্দু নারীর অবস্থান অনেকটাই সঙ্গীন। 'নারীর ক্ষমতায়ন' বলতে যা বোঝায় তা তাদের বেলায় অনেক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। হিন্দু ধর্মে নারীর জন্য যে ধর্মীয় অনুশাসন ও বিধি-বিধান রয়েছে, তা নারীর অধিকার পরিপন্থী। এই সমস্যা নিরসনে নেই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, নেই সিভিল সোসাইটীর উল্লেখ করার মতো কোন তৎপরতা। বাংলাদেশের একান্ত প্রতিবেশী ভারত এবং হিন্দু অধ্যুষিত দেশ নেপালে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে নারীর অধিকার সমুন্নত করা হয়েছে। যুগোপযোগী নারী অনুকূল আইন প্রণীত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের হিন্দু পারিবারিক আইন বৃটিশ আমলের পরে আর কোন পরিবর্তন বা সংস্কার হয়নি। ফলে এখানকার হিন্দু নারীদের আর্থ-সমাজিক অবস্থানেরও কোন পরিবর্তন হয়নি। ফলে একুশ শতকে এসেও এ দেশের হিন্দু নারীরা পুরুষের ক্রীড়ানক হয়ে আছে।

স্পর্শকাতর এই বিষয়ের উপর তেমন কোন মাঠ গবেষণা নেই। ফলে উত্তরাধিকার বঞ্চিত বাংলাদেশের হিন্দু নারীর অবস্থান নির্ণয়ের কাজটি সমাপ্ত করতে আমাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। এই গবেষণায়, হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ, হিন্দু পারিবারিক আইন, আন্তর্জাতিক সনদ, জাতীয় নীতি, প্রতিবেশী দেশগুলোর নারী অধিকার চিত্র ও মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতার আলোকে বাংলাদেশের হিন্দু নারীর অবস্থান নির্ণয় করা আমার মতো নবীন গবেষকের পক্ষে খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু এই দুরূহ কাজটি সম্ভব করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন আমার তত্ত্বাবধায়ক বৃন্দ। গবেষণা চলাকালীন যখনই কোন সমস্যায় পড়েছি আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. তাসনিম আরেফা সিদ্দিকী প্রয়োজনীয় নির্দেশনার পাশাপাশি উৎসাহব্যঞ্জক ভাষা দিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করতেন। আমি তার প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

এছাড়া হিন্দু আইন সম্পর্কে আমাকে ব্যাপক ধারণা এবং তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন আইন বিভাগের শিক্ষক, আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক ড. শাহনাজ হুদা। আমি একইভাবে তার কাছেও কৃতজ্ঞ।

যে সকল সংস্থা বিভিন্ন প্রকার তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছে আমি তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এক্ষেত্রে যাদের নাম উল্লেখ না করলেই নয় তারা হচ্ছে, অধিকার, আইন ও শালিস কেন্দ্র, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, মহিলা আইনজীবী সমিতি, রেফুইজি এ্যান্ড মাইগ্রেটরী মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু), স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, নারীপক্ষ এবং নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রী ধীরেণ বারুরী মহাশয়কে যিনি স্কুলে হিন্দু ধর্ম পাঠদানের কারণে সকলের কাছে পণ্ডিত স্যার হিসেবে এবং সকলের কাছে হিন্দু ধর্ম গবেষক হিসেবে সুপরিচিত। তিনি হিন্দু ধর্মে নারীর অবস্থান বিষয়ে তথ্য দিয়ে এই গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালি বিভাগের অধ্যাপক পরেশ স্যারও আমাকে সহায়তা দিয়েছেন। আমি তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এই কাজটি সম্ভব করার ক্ষেত্রে আমার পরিবারের অবদানও অনেক। বিশেষ করে যার কথা উল্লেখ না করলেই নয় সে আমার আত্মজ, রূপ। এই গবেষণার পেছনে সময় দিতে গিয়ে ও আমার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এছাড়া পরিবারের অন্যান্যরা আমাকে বিষয় সংক্রান্ত তথ্য এবং পরামর্শ দিয়ে গবেষণাটিকে সহজ করে তুলেছিল। তাদের আন্তরিক সহযোগিতার কারণেই আমার এই গবেষণা কর্মটি সুসম্পন্ন হয়েছে। এজন্য আমার পরিবারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে, হিন্দু নারীর অবস্থান চিত্র ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যে সকল নারী তাদের ব্যক্তি জীবনের তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন তাদের কাছে আমি ঋণী। এই গবেষণা নারীর ভাগ্যোন্নয়নে অবদান রাখলেই কেবল এই ঋণের কিছুটা শোধ করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সারমর্ম

বাংলাদেশে উত্তরাধিকার বঞ্চিত হিন্দু নারীর সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান শীর্ষক - গবেষণা কর্মটি ২০০৪-২০০৫ সালের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে। এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, উত্তরাধিকার বঞ্চিত হিন্দু নারীর আর্থ-সামাজিক সমস্যার স্বরূপ উন্মোচনপূর্বক জাতীয় বিতর্কের সূচনা করা ও তাদের ক্ষমতায়নের পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সংশিষ্ট মহলকে প্রনোদিত করা। গবেষণায় সেকেন্ডারী এবং প্রাইমারী উভয় ধরনের তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। সেকেন্ডারী তথ্য হিসেবে বিভিন্ন হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ, আইনগ্রন্থ, সংবিধান, সনদ, বিষয় সংশিষ্ট সেমিনার পেপার, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ও অন্যান্য নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রাইমারী তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানার দুইটি গ্রাম, মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় থানার দুটি গ্রাম, বরিশাল জেলার বরিশাল সদর থানার একটি ওয়ার্ড এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের তিনটি ওয়ার্ড থেকে। এসব এলাকা থেকে নমনীয় প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ১০০ জন বিধবা ও ১০০ সধবার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মতামত নেওয়া হয়েছে বিষয় সংশিষ্ট ২৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির। উলিখিত উপায়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে গোটা সম্প্রদায়ের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। পিতৃতন্ত্র তত্ত্বের আলোকে বিশেযিত এই গবেষণায় হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ও হিন্দু পারিবারিক আইনে নারীর অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। হিন্দু নারীর বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে মাঠ পর্যায়ের তথ্যের নিরিখে। এছাড়া আন্তর্জাতিক সনদ সিডও, বাংলাদেশ সংবিধান এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে সন্নিবেশিত নারীর অবস্থানের সঙ্গেও হিন্দু নারীর অবস্থানের দূরত্ব চিত্রণের চেষ্টা করা হয়েছে।

সেকেন্ডরী তথ্য পর্যালোচনা ও মাঠ গবেষণায় দেখা যায়, প্রাচীন কাল হতে হিন্দু নারীর জীবন যাপনের জন্য পৈত্রিক সম্পত্তি ও পতির সম্পত্তিতে যে আধিকার রাখা হয়েছে তা খুবই সীমিত ও অত্যন্ত জটিল। উত্তরাধিকার বলতে যা বোঝায় বাস্তবিক অর্থে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, উত্তরাধিকার বঞ্চিত ৬৫% বিধবার আর্থ-সামাজিক অবস্থা একেবারেই শোচনীয় এবং উপায়ান্তরহীন। বাকী ৩৫% বিধবা স্বামীর পরিবার বা ছেলেদের উপর র্নিভর করে জীবন-যাপন করছেন। পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের মতামত কদাচিৎ গুরুত্ব পায়। অন্যের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকা এবং 'নিয়তি নির্ভর' জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এই নারীদের ৮৯% পৈত্রিক ও স্বামীর সম্পত্তির উপর নারীর উত্তরাধিকারের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে মত দেন। ৭% এর বিরোধিতা করেন। ৪% মন্তব্য থেকে বিরত থাকেন। তাদের অনেকে নিজের অধিকারের চেয়ে পারবারিক ঐতিহ্য এবং পরিবারের সম্মান রক্ষার ব্যাপারে বেশী সচেতন দেখা যায়। ৩৪% মনে করেন নারী ও পুরুষের উত্তরাধিকার সমান হওয়া উচিত।

অন্যদিকে, পৈত্রিক সম্পত্তি পাওয়ার প্রশ্নে সধবা হিন্দু নারীদের ৫২% মনে করেন বাবার বাড়ির সম্পত্তি না আনাই ভালো। কেননা বিবাহের সময়ে যে যৌতুক দেওয়া হয় তা সম্পত্তির তুলনায় কোন অংশেই কম নয়। অন্যদিকে, ৪৮% মনে করেন পৈত্রিক সম্পত্তিতে ভাই-বোনের অধিকার সমান হওয়া উচিত। ৮০% সধবা মনে করেন স্বামীর মৃত্যুর পর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। ২০% সধবা এই বিষয়ের জটিলতা ও পারিবারিক অশান্তির কারণে মতামত প্রদান থেকে বিরত থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু বিবাহে যৌতুক প্রথাকে ৫১% সমর্থন করেন না এবং ৪৯% সমর্থন করেন। যারা সমর্থন করেন তাদের যুক্তি হচ্ছে, যেহেতু মেয়েরা বিয়ের পর বাবার বাড়ি থেকে একেবারেই চলে যায় সেহেতু তাদের সম্পত্তির পরিবর্তে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গ্রহণ করাই ঠিক। হিন্দু বিবাহে রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ৩১% ইতিবাচক, ৫০% নেতিবাচক এবং ১৯% মন্ত ব্য থেকে বিরত থাকেন। যারা রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে নেতিবাচক মতামত দেন তারা মূলত এর আইনগত দিক সম্পর্কে তেমনভাবে সচেতন নয়। এক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের নারী-পুরুষের বিবাহ বিচ্ছেদের আনুপাতিক হার সম্পর্কে অনেকে অলোকপাত করেন।

সধবা-বিধবাদের তুলনামূলক অবস্থান বিশেষণে দেখা যায়, সকল হিন্দু নারীই কোন না কোনভাবে পুরুষের উপরে নির্ভরশীল। তবে যাদের স্বামী বর্তমান তাদের তুলনায় যাদের স্বামী মৃত তাদের সমস্যাই প্রকট। সম্পত্তি না পাওয়া, বিবাহে যৌতুক দেওয়া, কন্যা হিসেবে ভাইয়ের সমান অধিকার না পাওয়া, বর্ণ প্রথা, বাল্য বিবাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সকল নারীর অবস্থানই প্রায় এক রকম। পুরুষতন্ত্রের নিয়ম এমনভাবে হিন্দু নারীর অস্তিত্বে মিশে গেছে যে, নারীর আত্ম পরিচয় বলে কিছু থাকে না। তাদের পরিচয় হয় অমুকের মেয়ে, তমুকের স্ত্রী, অমুকের মা এভাবে। একসময় সমাজতো বটেই, নিতান্ত আপনজন এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে নারী নিজেই তার নামটিও ভুলে যান।

হিন্দু নারীর উত্তরাধিকার প্রশ্নে বিশেষজ্ঞ বুদ্ধিজীবি, নীতি নির্ধারক ও সমাজপতিদের বেশিরভাগই ইতিবাচক মত দেন। তারা মনে করেন নারীর ক্ষমতায়নের মূল শর্ত সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা। এই জন্য তারা আন্তর্জাতিক সনদ ও দেশীয় নীতির আলোকে হিন্দু পারিবারিক আইনের পরিবর্তন দরকার বলে মত দেন। এই কাতারের তথ্যদাতাদের কয়েকজন ধর্মান্তরের শঙ্কায় হিন্দু নারীর সম্পত্তির অধিকারের বিরোধিতা করে বলেন এতে হিন্দুদের সামাজিক সমস্যা বাড়বে যা রোধ করার রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক নিশ্চয়তা নেই। হিন্দু ধর্মীয় প্রতিনিধিদের কেউ কেউ বলেন, হিন্দু মেয়েদের 'দেবীর আসনে' রাখা হয়েছে এর পরে আর নতুন কোন অধিকারের দরকার নেই।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত ও বিশেষজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে এই সুপারিশ করা যাচ্ছে যে, উত্তরাধিকার আইনে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। হিন্দু বিবাহের ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় বিবাহের পাশাপাশি প্রতিটি বিবাহে নিবন্ধীকরণ করতে হবে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিবাহ বিচ্ছেদ ও অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ উভয়েরই অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। বিধবা, অনূঢ়া (চিরকুমারী) বা স্বামী সাহায্যবিহীন নারীকে দত্তক (পুত্র ও কন্যা) গ্রহণের আধিকার দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
অধ্যায় ১: গবেষণার পটভূমি ও গবেষণা পরিচালনা পদ্ধতি	---------	০১
ক. গবেষণার পটভূমি	---------	০১
খ. গবেষণা পরিচালনা পদ্ধতি	---------	০৭
অধ্যায় ২: মাধ্যমিক তথ্য পর্যালোচনা	---------	১১
ক. হিন্দু ধর্মগ্রন্থে নারীর অবস্থান	---------	১১
খ. হিন্দু পারিবারিক আইনের উৎস	---------	১৬
গ. হিন্দু পারিবারিক আইনে নারীর অধিকার: বাংলাদেশ ও ভারতের তুলনামূলক চিত্র	---------	১৯
অধ্যায় ৩: নারীর ক্ষমতায়ন: তাত্ত্বিক আলোচনা, ক্ষমতায়ন পর্যালোচনা ও হিন্দু নারীর ক্ষমতায়ন	---------	২৫
ক. নারীর ক্ষমতায়ন: তাত্ত্বিক আলোচনা	---------	২৫
খ. পিতৃতন্ত্র ও বাংলাদেশের সমাজ	---------	২৭
গ. পুরুষতন্ত্রের আলোকে বাংলাদেশের হিন্দু নারীর ক্ষমতায়ন বিশ্লেষণ	---------	৩০
অধ্যায় ৪: নারীর ক্ষমতায়নে আন্তর্জাতিক সনদ, জাতীয় নীতি ও হিন্দু নারীর অবস্থান	---------	৩২
ক. সিডও সনদ ও বাংলাদেশের হিন্দু নারী	---------	৩২
খ. বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও হিন্দু নারী	---------	৩৫
অধ্যায় ৫: বাংলাদেশে হিন্দু নারীর বাস্তব অবস্থান: মাঠ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য	---------	৩৭
ক. হিন্দু বিধবাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান	---------	৩৭
খ. হিন্দু সধবাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান	---------	৪৫
অধ্যায় ৬: বাংলাদেশে হিন্দু নারীর ক্ষমতায়ন: বিশেষজ্ঞ মতামত	---------	৫১
অধ্যায় ৭: উপসংহার ও সুপারিশমালা	---------	৫৪

Dhaka University Institutional Repository

সারণী সূচী

			পৃষ্ঠা
সারণী ১	: গবেষণা এলাকা	------------	০৭
সারণী ২	: যাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে	------------	০৮
সারণী ৩	: বিধবাদের সম্পত্তি প্রাপ্তির চিত্র	------------	৩৮
সারণী ৪	: পৈত্রিক সম্পত্তিতে ছেলে মেয়ে উভয়ের সমান অংশীদারিত্ব থাকা উচিত- এসম্পর্কে বিধবাদের মতামত	------------	৩৮
সারণী ৫	: বিধবাদের বর্তমান বয়স	------------	৩৯
সারণী ৬	: বিধবাদের বর্তমান অবস্থান	------------	৪৩
সারণী ৭	: বিধবাদের বিবাহের বয়স	------------	৪৪
সারণী ৮	: যৌতুক প্রথা সম্পর্কে সধবাদের মতামত	------------	৪৫
সারণী ৯	: নারীর অধিকার রক্ষায় বিবাহ রেজিস্ট্রেশন দরকার	------------	৪৬
সারণী ১০	: সধবাদের বর্তমান বয়স	------------	৪৮
সারণী ১১	: হিন্দু নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক ভাবে নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য যা দরকার	------------	৪৯

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ১

গবেষণার পটভূমি ও পরিচালনা পদ্ধতি

ক) গবেষণার পটভূমিঃ

প্রাচীন ও মধ্য যুগে ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসনই ছিল আইন, যে আইন রাষ্ট্র কর্তৃক সমাজ ও ব্যক্তি মানুষের উপর বলবৎ করা হতো। ধর্মীয় বিধানই ছিল রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দিক নির্দেশনা। একবিংশ শতকেও ধর্মীয় সেই জীবনধারা বহুলাংশে অব্যাহত আছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে সাম্প্রতিক কালে রাষ্ট্রীয় আইনের (এমন অনেক আইন আছে যা ধর্মীয় অনুশাসনের আলোকে তৈরি) মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত হলেও পারিবারিক জীবনে এখনও ধর্মীয় অনুশাসন বলবত। পারিবারিক আইনে নারী ও পুরুষের অধিকার সমান নয়, রয়েছে ব্যাপক বৈষম্য। এই বৈষম্য নারীর মানবাধিকারকে ক্ষুণ্ন করেছে।

নারীর উন্নয়ন ও নারী-পুরুষের মাঝে সমতা আনয়ন মানবাধিকারের পূর্বশর্ত। মানুষকে মানুষ রূপ দেবার জন্যই মানবাধিকার অপরিহার্য। নারীর মানবাধিকার রক্ষায় বিভিন্ন সময়েই জাতিসংঘ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যদিও জাতিসংঘ কর্তৃক নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ গৃহীত হয়েছে, কিন্তু সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী আজও তার অধিকার অর্জনে সফল হয়নি (হুদা এবং অহিদুজ্জামান, ২০০১; পৃষ্ঠা ১৪৩-১৪৪)।

সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে নারীর মানবাধিকার রক্ষায় সিডও সনদ অনুসারে সংবিধানে সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করেছে। যদিও অনেক ক্ষেত্রে এর পার্থক্য রয়েছে। তবুও ধর্মীয় বিধানের সুযোগে রাষ্ট্রীয় অনেক অধিকার হতেই বঞ্চিত হচ্ছে এদেশেরই নারীরা। যেমন হিন্দু পারিবারিক আইনের কারণে নারীর মানবাধিকার অনেকাংশই লঙ্ঘিত হচ্ছে ।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্যে অন্যতম হিন্দু ধর্ম। যার শাস্ত্রীয় নাম সনাতন ধর্ম। চিরন্তন এই ধর্মের সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান কেমন ছিল তা সুনির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে ইতিহাস থেকে যতটুকু জানা যায় তাতে দেখা যায়, কৃষি বিপ্লবের ফলে নারী ঐতিহাসিক পরাজয়ের মাধ্যমে মাতৃতন্ত্রের পরবর্তীকালে যে পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে তাতে নারী রূপান্তরিত হয় দাসে (অজাদ, ১৯৯২; পৃ. ৫৪)। বৈদিক যুগ থেকেই প্রাচীন ভারতের হিন্দু সমাজ আর্য ও দাস এ দুটো শ্রেনীতে বিভক্ত ছিল। ঋগবেদেও পনুঃ পুনঃ মহিলা দাস দাসীর উল্লেখ থাকলেও পুরুষ দাসের উল্লেখ কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয় (শর্মা, ১৯৮৩. পৃ. ৩৮। ঋগ্বেদেই বলা হয়েছে পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্য্যা অর্থাৎ পুত্র জন্মদানের জন্যই নারী। তাই যুগে যুগে ব্যক্তিগত ধনভিত্তিক পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পুত্রের জন্ম দিয়ে পুরুষের ধন সম্পত্তি ও বংশ গতি রক্ষা করার জন্যই ।

প্রাচীন হিন্দু যুগ হতেই ধর্ম ও শাস্ত্রে নারীর অধিকার ও মর্যদার বিষয়টি দুটি বিপরীত চিন্তার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। মহাভারতে নারী অকল্যাণকর এবং অশুভ বলে চিহ্নিত। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে, সর্বগুণান্বিতা নারীও অধমতম পুরুষ থেকে হীন। অপরদিকে আবার ঋগ্বেদেই নারীর স্বাধীনতাকে স্বীকার করেছে ধর্মীয় আচার আচরন পালনের ক্ষেত্রে। পুরাণে গার্গী নাম্নী নারী ঋষির উল্লেখ রয়েছে। হিন্দু ধর্মের এই ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামুলক আলোচনা থেকে বলা যায় যে প্রাচীন শাস্ত্রকাদের ধর্মের শাস্ত্রোক্ত আচার-বিচার, বিধি-বিধানের মধ্যেই নিহিত ছিল পুরুষের প্রাধান্য। এ কারণেই হিন্দু আইনের প্রধান উৎস শ্রুতি তথা বেদ আধ্যাত্মীক আলোচনা ও পাঠ নারীর জন্য নিষিদ্ধ। নারী কখনো পূজায় পৌরহিত্য করতে পারবে না। তদুপরি তার উপনয়নের অধিকারও নেই। তাই পরিলক্ষিত হয় যে, নারী অবদমনের প্রধান হাতিয়ার ছিল শাস্ত্রোক্ত বিধি-বিধান।

পিতৃতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বংশ রক্ষা এবং শ্রাদ্ধ, পিন্ড প্রভৃতি ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের দ্বারা কল্পিত স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করার জন্যই প্রয়োজন ছিল পুত্রের। বেদের মতে তাই পুত্র সন্তান অপরিহার্য। এখানে উল্লেখ্য যে, হিন্দু আইনে বলা আছে মৃতের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন একমাত্র পিন্ডদানের অধিকারীগণ। সাধারণভাবে পিন্ডদানের অধিকারীই সপিন্ড[1]। কোন ব্যক্তি তার পিতৃকুল মাতৃকুলের তিন পুরুষকেই অর্থাৎ পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এবং মাতা, মাতামহ এবং প্রমাতাহের শ্রাদ্ধে পিন্ডদান করতে পারেন। হিন্দু শাস্ত্রে কেবল ৫ জন নারীকে সপিন্ড হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। যাদের মধ্যে রয়েছে বিধবা, কন্যা, মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী। পাঁচজন মহিলাসহ সপিন্ডর অধিকারী মোট ৫৩ জন। এদের মধ্যে বিধবার অবস্থান ৪, কন্যার ৫, মাতা ৮, পিতামহী ১৪ এবং প্রপিতামহী ২০। এই অবস্থানের ফলে অনেক সময়েই তারা উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয়। তাই শাস্ত্রীয় বিধানে নারীর পুত্র সন্তান জন্ম দেয়াই ছিল প্রধান আরাধ্য।

হিন্দু নারীর অবস্থান আরো পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন ঋষি মনু। মনুসংহিতার (মনুসংহিতা, ১৯৯৪; পৃ. ৩৭৪) নবম অধ্যায়ের ৩ নং শ্লোকে বলা হয়েছে,

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষতি স্থবিরে পুত্রা না স্ত্রী স্বাতন্ত্রমহতি।।"

---

[1] সপিন্ডঃ পূর্ব পুরুষের মঙ্গল কামনায় পুরুষেরা ঘি অন্ন সহ নানাবিধ দ্রব্যাদির নম্বয়ে অগ্নিতে শিশ্রিত দব্য দান করার অধিকার'কে বোঝায়।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, হিন্দু নারী 'বাল্যে পিতার সংসারে, যৌবনে স্বামীর সংসারে, বার্ধক্যে সন্তানের সংসারে' পরমুখাপেক্ষী হয়ে জীবনযাপন করবে।

শাস্ত্রমতে, বৈদিক যুগের শেষভাগেই নারী হয়ে গিয়েছিল শূদ্র কুকুর ও কালো পাখির মতো মিথ্যা (উল্লাহঃ ২০০২; পৃ.৪১)। ঋগবেদের পুরুষ সূক্ত অনুসরণ করে বৈদিক যুগের শেষভাগে চতুর্থ বর্ণরূপে শূদ্র বর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল। শাস্ত্রে এই চার বর্ণের আচার সম্পর্কে বিষদ বিবরণ রয়েছে। এই আচার পালন করাই সনাতন এই ধর্মের মৌলিকতা। উল্লেখ্য এই আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মধ্যে শাস্ত্রের অনুশাসনে শূদ্রের সাথে একই স্থানে বসানো হয়েছিল সব বর্ণের নারীকে। এই বর্ণ বিন্যাসে শূদ্রের ভাগ্যে জোটে অপর তিন বর্ণের দাসত্ব এবং কায়িক শ্রমে খুশি করা। অন্যদিকে নারীর কাঁধে চাপানো হল পরিবারের মধ্যে পুরুষের দাসত্ব করা। ধর্মের অভ্যন্তরে এহেন অবস্থান নারীকে অধিকার হতে বঞ্চিত করেছে। উল্লেখ্য হিন্দু ধর্মের চারটি বর্ণ হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

শ্রীমদ্ভগবত গীতায় শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ চর্তুবর্ণ সমর্থন করে নবম অধ্যায়ের ৩২ নং শ্লোকে উল্লেখ করে বলেন যে, "মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেহপি স্যু পাপযোনয়। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম।" অর্থাৎ, হে পার্থ স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্র অথবা যাহারা পাপযোনী সম্ভূত অন্ত্যজ জাতি তাহারাও আমার আশ্রয় লইলে নিশ্চয়ই পরম গতি প্রাপ্ত হন। (গীতা, ১৯৫৮: পৃষ্ঠা ৩৮৬, শ্লোক-৩২) বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী (নারী) ও শুদ্র যদি একটি 'পরমগোপন স্তব শোনে, তবে তারা রুদ্রলোক পায়। সব শাস্ত্রে নারীকে পাপী এবং শূদ্রের সাথে এক করে দেখানোই ছিল রীতি। ধর্মীয় বিধানে নারীর পক্ষে সূর্য চন্দ্র এবং বৃক্ষকে অবলোকন করাও নিষেধ রয়েছিল। গৃহের অভ্যন্তরে কায়োমনোবাক্যে সংযতা হয়ে স্বামীর সেবা করাই ছিল স্বাধ্বী এবং পতিব্রতা স্ত্রীর ধর্ম, এবং মৃত্যুর পর কল্পিত স্বর্গ লাভের উপায়, সেই স্বামী যতই দুষ্ট এবং ভ্রষ্ট চারী হোকনা কেন। স্মৃতিশাস্ত্রের যুগে শাস্ত্রকারদের মতে বাগদানেও কন্যার বিবাহ সমাপ্ত বলে গণ্য করা হতো। ফলে বিবাহ অসম্পূর্ণ থাকলেও বা কন্যা কোন দিন স্বামীর সাথে বসবাস না করলেও পতিব্রতধর্ম পালন করাই হলো কন্যার ভবিতব্য। যুগের পরিবর্তনে এবং সময়ের সাথে সাথে শাস্ত্রীয় সমর্থনে এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নারী এভাবে একসময়ে পরিণত হয় কেবল পুরুষের ভোগ্যপণ্যে। মধ্যযুগে নারীর জন্মই ছিল আতংকের বিষয়। ইতিহাসে স্থান পায় কন্যা সন্তান হত্যা এবং কন্যা-ভ্রুণ হত্যার বিষয়টি। প্রসঙ্গত, সেই সময়ে চতুবর্ণের মধ্যে নিম্ন বর্ণের নারী অন্যান্য নারীদের তুলনায় কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করতো।

হিন্দু ধর্মে প্রচলিত মতবাদগুলোর মধ্যে প্রধানত দু'টো মতবাদ দিয়ে হিন্দু পারিবারিক আইন নিয়ন্ত্রিত হয় - একটি মিতক্ষরা অন্যটি দায়ভাগ। উভয় মতবাদেই নারীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ (হুদা, ২০০১: পৃ. ১৪৫)। কেননা এই মতবাদগুলোর মধ্যে উত্তরাধিকার নীতি আবার দুই ধরনের। অর্থাৎ নারী-পুরুষের জন্য উত্তরাধিকার নীতি এক নয়। হিন্দু আইনে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তার ওয়ারিশগণ সম্পূর্ণ স্বত্বে সম্পত্তি পাওয়ার কথা। কিন্তু কোন মহিলা সীমিত স্বত্বে অর্থাৎ জীবনসত্ব বা ভোগস্বত্ব কোন সম্পত্তি পেলে মহিলার মৃত্যুর পর উক্ত মহিলা যার সম্পত্তি পেয়েছিলেন তার নিকটবর্তী সপিন্ড এ সম্পত্তির মালিক হবেন। অর্থাৎ হিন্দু আইনে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর স্বার্থে সীমিত সম্পত্তির অধিকারীর দখলে থাকায় স্বত্বে অধিকারীর মৃত্যু পর্যন্ত এর উত্তারধিকার স্থগিত থাকে (ধর, ১৯৯৭: পৃ. ১২৫) । অর্থাৎ

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষ যখন কোন সম্পত্তির মালিকানা পায় তখন ঐ সম্পত্তিতে তার নিরঙ্কুশ মালিকানা থাকে। অন্যদিকে নারীরা সাধারণত সম্পত্তির নিরঙ্কুশ উত্তরাধিকারী হয়না, শুধু ভোগসত্ত্বের অধিকারী হয়, অর্থাৎ সীমিত মালিকানা পেয়ে থাকে।

অখন্ড ভারতে অর্থাৎ, ১৯৪৭ সালের পূর্বে উপনিবেশিক সরকারের ক্ষমতা ছিল হিন্দু পারিবারিক আইন পরিবর্তনের। এই ক্ষমতাবলে তারা তৎকালীন ভারত বর্ষের হিন্দু পারিবারিক আইনের যেমন ১৯২৯ সালে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার ফলে "শিশু বিবাহ নিরোধ আইন " আইন পাশ করা হয়। পরবর্তীতে রাজা রাম মোহন রায় ও ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার ফলে ১৮৫৬ সালে হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়। এছাড়া তারা সতী দাহ প্রথা রদ আইন প্রণয়ন করেছিলেন। ১৯৫৬ সালে বিবাহিতা নারীর পৃথক বসবাস এবং ভরনপোষণ আইন পাস হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ সনের পরে এসব আইন বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের জন্য প্রযোজ্য ছিল। এর পরে বাংলাদেশে তখন হিন্দু নারীর উত্তরাধিকারে আইনের আর কোন পরিবর্তন আনা হয়নি।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ভারতে হিন্দু পারিবারিক আইনের বেশ কয়েকটি বড় পরিবর্তন আনা হলেও পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তেমনটি হয়নি। এমনকি স্বাধীনতার তিন দশক গত হওয়ার পর এ পর্যন্ত বাংলাদেশের হিন্দু পারিবারিক আইনের কোন সংস্কার আনা হয়নি। বাংলাদেশে হিন্দু পারিবারিক আইনের সংস্কার সেখানেই থেমে রয়েছে, যেখানে রেখে গিয়েছিলেন ব্রিটিশরা। ১৯৩০ এর দশক থেকেই ভারতে হিন্দু আইন পারিবারিক আইনের প্রতিবন্ধকতাগুলো অপসারণ করে নারীর অধিকার সংরক্ষণে আইন প্রণয়নের দাবী ওঠে। গোঁড়া হিন্দুরা এই সংস্কারগুলোকে স্মৃতি ও শ্রুতি, সংহিতার জন্য অবমাননাকর হিসেবে তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯৫০ এর দশকে সংহিতার বিধানে সংস্কার এনে ৪টি আইন পাশ হয়। এগুলো হচ্ছে- ক) হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫; খ) হিন্দু নাবালকত্ব ও অভিভাবকত্ব আইন, ১৯৫৬; গ) হিন্দু দত্তক গ্রহণ ও প্রতিপালন আইন, ১৯৫৬; ঘ) হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬। উল্লেখ্য, এসব আইন বাংলাদেশে প্রযোজ্য নয়।

প্রতিবেশী ভারতে এখন নারীদের সমঅধিকারের জন্য সমস্ত আইন কানুন নির্ধারিত। সেখানে স্বামী ও পিতার সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত। ভারতের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ৮ নম্বর ধারায় স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীদের অধিকার সম্পর্কে বিশদভাবে লেখা রয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন হিন্দু পুরুষ কোনও দলিল বা টেস্টামেন্ট মারফত কাউকে কিছু দিয়ে না গেলে, তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্ণয় হবে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ৮ নং ধারা এবং ওই আইনের তফসিল বর্ণিত তালিকা মতে। বলা বাহুল্য এই আইনে স্ত্রীকে স্বামীর সম্পত্তির বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে হিন্দু আইন পরিবর্তন না হওয়ার কারণে নারী আজও ধর্মীয় আচার আচরণ ও বিধি-বিধানের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। নারী পরিবারের ভেতরে ও বাইরে তথাকথিত ধর্মীয় বিধি বিধান, আচার আচরণের ধারক বাহক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মধ্যযুগের প্রেক্ষিতে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, পুরুষের প্রাধান্য এবং নারী সার্বিক হীনত্বের তত্ত্ব মানুষের মধ্যে মনের ভেতরে প্রবেশ

Dhaka University Institutional Repository

করিয়ে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরানের উপাখ্যানের মাধ্যমে যে সব ব্রত উপবাস পালনের রীতি বিশেষভাবে নারীর জন্য প্রবর্তীত হয়েছিল আজও নারীরা তা নির্দিধায় পালন করে চলছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

উত্তরাধিকার বঞ্চিত হিন্দু নারীর আর্থ-সামাজিক সমস্যার স্বরূপ উন্মোচনপূর্বক জাতীয় বিতর্কের সূচনা করা ও তাদের নিরাপত্তা বিধান ও ক্ষমতায়নের পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট মহলকে প্রনোদিত করা।

গবেষণার যৌক্তিকতা

একবিংশ শতকের এই যুগেও বাংলাদেশের হিন্দু নারীর জীবন পরিচালিত হয় বৈদিক যুগের আইন দ্বারা। বর্তমান যুগ নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার যুগ। জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন পরিকল্পনার ৮টি লক্ষ্য মাত্রার একটি হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন। এই উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশে নারীর নিরাপত্তা বিধান ও ক্ষমতায়নে সরকার এবং বিভিন্ন এনজিও ব্যাপকভাবে কার্যক্রম চালাচ্ছে বলে ব্যাপক প্রচার আছে। কিন্তু এ দেশে হিন্দু নারীর অধিকার বঞ্চনার বিষয়টি প্রায় অগোচরেই থেকে গেছে। ফলতঃ অনেক সমস্যার মাঝে হিন্দু নারীর এই সমস্যাটি অনেকেরই অজানা রয়ে গেছে। এর উপর প্রায়োগিক কোন গবেষণাও হয়নি। হিন্দু নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকার বা এনজিও কেউই আলাদাভাবে হিন্দু আইন সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেয়নি। রাজনৈতিক দলগুলোও একে একটি সংখ্যালঘু এবং সাম্প্রদায়িক ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করে পাশ কাটিয়ে গেছে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার দিক হতে হিন্দু দ্বিতীয় (জনসংখ্যা পরিসংখ্যান, ২০০৫: পৃ.৮)। যাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন পরিচালিত হয়ে আসছে হিন্দু পারিবারিক আইনের মাধ্যমে। বাংলাদেশে হিন্দু পারিবারিক আইনগুলো পরিচালিত হয় দায়ভাগা স্কুল কর্তৃক পরিচালিত আইনের মাধ্যমে। এই আইনে হিন্দু নারীর অবস্থান একটা বিশেষ স্থানে বলে চিহ্নিত হলেও বাস্তবিকতায় হিন্দু নারীর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে অত্যন্ত সীমিত অধিকার রয়েছে যা নারীর মানবাধিকারকে ক্ষুন্ন করেছে। এছাড়াও আর একটি বিষয় রয়েছে তা হল, সনাতন আইন বলবত থাকায় হিন্দু নারী নির্যাতনের স্বীকার হলেও প্রচলিত আইনের আওতায় বিচার চাইতে পারে না। ফলে নারী নির্যাতনের শিকার হলেও আইনের সাহায্য গ্রহণ দুঃসাধ্য হয়। গবেষণার মাধ্যমে হিন্দু নারীর সামাজিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা গেলে এ আইনের সংস্কারের কিছু পথ বের হবে বলে ধারণা করা হয়।

গবেষণা কাজের পরিধি

- হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে নারীর অবস্থান কি তা নির্ণয়;
- হিন্দু পারিবারিক আইনের উৎস অনুসন্ধান ও পার্শ্ববর্তী ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের পারিবারিক আইনের তুলনা;
- সার্বজনীন আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার সনদ জাতীয় নীতির আলোকে হিন্দু নারীর অবস্থান নির্নয়;
- সম্পত্তির অধিকার না থাকায় বাংলাদেশের হিন্দু নারীরা কতটা নিরাপত্তাহীন তা খুঁজে বের করা;

Dhaka University Institutional Repository

- হিন্দু নারীর ক্ষমতায়নের পথে প্রতিবন্ধকতাগুলো কি তা নির্ণয় করা;
- উত্তরাধিকার বঞ্চিত হিন্দু নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের উপায়সমূহ চিহ্নিত করা;

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

- গবেষণায় কয়েকটি নির্বাচিত এলাকা থেকে ১০০ জন বিধবা ও ১০০ সধবার সঙ্গে কথা বলে এবং ২৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমতের ভিত্তিতে গোটা সম্প্রদায়ের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।
- দীর্ঘদিনের এই সমস্যাটি সংক্ষিপ্ত সময়ে, স্বল্প পরিসরে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- হিন্দু ধর্মের রীতি নীতি বেশীরভাগই প্রচলিত ও গতানুগতিক এবং স্থান ভেদে ভিন্ন যার লিখিত রূপ অনুপস্থিত যা পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে।
- পরিবার পর্যায় থেকে প্রাইমারী তথ্য সংগ্রহ করার বিষয়টিও কষ্টসাধ্য। পারিবারিক অশান্তির ভয়ে নারীরা বাইরের লোকের কাছে মুখ খুলতে চায় না। নিজের শত কষ্ট ও বঞ্চনার মাঝেও একে তারা পারিবারিক বিষয় এবং মেয়েদের নিয়তি মনে করে। পরিবারের মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে এই ভেবে তথ্য আড়ালের চেষ্টা করেন কেউ কেউ। বেশ কয়েকজনের সঙ্গে অনেক চেষ্টা করেও আলাদাভাবে কথা বলা যায়নি, বিভিন্ন অজুহাতে পরিবারের সদস্যদের কেউ না কেউ উপস্থিত ছিলেন ।
- সামাজিক রীতি অনুযায়ী বিবাহের সাথে সাথেই কার্যতঃ বাবার বাড়ির সাথে হিন্দু মেয়েদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তাই কেইস স্টাডিতে হিন্দু বধূর বাবার বাড়ি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জানা যায়নি।
- শতাব্দী প্রাচীন এই সামাজিক ইস্যুটি অনেকেরেই গা সওয়া হয়ে গেছে। অনেকেই জীবনের এই বাস্তবতাকে নিয়তি হিসেবে মেনে নিয়েছে। সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণপূর্বক আলোচনার উদ্দেশ্য তুলে ধরে গ্রামীণ নারীর মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত তথ্য বের করে আনা একটি কষ্টকর বিষয়।

প্রতিবেদন কাঠামো

এই প্রতিবেদন মোট ৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার পটভূমি, যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, পরিধি, পরিচলন পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে - সাহিত্য পর্যালোচনা শিরোনামে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে নারীর অবস্থান, হিন্দু আইনের উৎস এবং বাংলাদেশ ও ভারতের পারিবারিক আইনের তুলনামূলক চিত্র বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে- নারীর ক্ষমতায়নের তাত্ত্বিক আলোচনা, ক্ষমতায়ন পর্যালোচনা এবং হিন্দু নারীর ক্ষমতায়ন। ৪র্থ অধ্যায়ে- নারীর ক্ষমতায়নে গৃহীত আর্ন্তজাতিক সনদ ও জাতীয় নীতির আলোকে বাংলাদেশের হিন্দু নারীর অবস্থান নির্ণীত হয়েছে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে -বাংলাদেশে হিন্দু নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে মাঠ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ও বিশেষজ্ঞদেও মতামতের আলোকে। সবশেষে ৭ম অধ্যায়ে- সমাপনি মন্তব্য ও সুপারিশমালা তুলে ধরা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হিন্দু নারীর আর্থ সামাজিক অবস্থান চিত্র তুলে ধরতে এই গবেষণায় সমাজ বিজ্ঞানের পুরুষতন্ত্র এবং নারীর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন সনদ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে সমাজ বিজ্ঞানের পিতৃতন্ত্রের উৎস সন্ধান করে এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এরই আলোকে হিন্দু নারীর জীবন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ক্ষমতায়ন তত্ত্ব অনুসারে নারীর ক্ষমতায়ন এবং এর আলোকে বাংলাদেশে হিন্দু নারীর জীবন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থান চিত্র ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার রূপরেখা: বাংলাদেশে উত্তরাধিকার বঞ্চিত হিন্দু নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান শীর্ষক এই গবেষণার কাঠামো নিম্নরূপ:

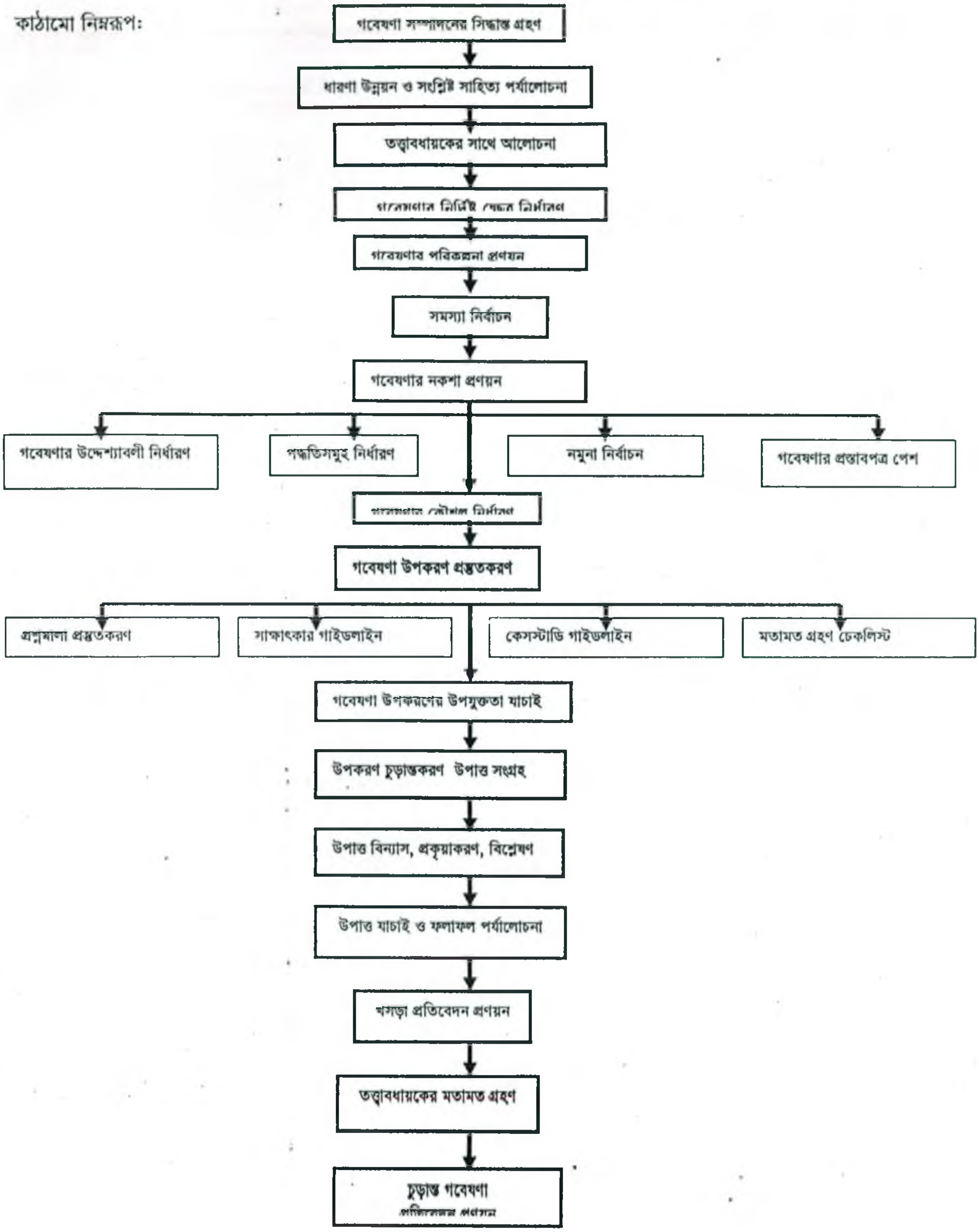

Dhaka University Institutional Repository

খ. গবেষণা পরিচালনা পদ্ধতি

গবেষণা এলাকা নির্বাচন

বাংলাদেশে হিন্দু নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান চিত্র তুলে ধরার জন্য পারপাসিভ (Purposive) নমুনায়ন পদ্ধতিতে এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে। এই গবেষণায় বাংলাদেশের হিন্দু অধ্যুষিত মোট চারটি জেলার ৫টি থানার ৭টি ইউনিয়নের ৭টি গ্রাম/মহল্লায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। অভিজ্ঞমহলের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এই কর্ম এলাকা নির্বাচন করা হয়। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর সহজলভ্যতা প্রবেশগম্যতা এবং আর্থ-সামাজিক বৈচিত্র্য ইত্যাকার বিষয়গুলো বিবেচনা করে এলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

গবেষণায় যেসব এলাকা হতে কেইস স্টাডি গ্রহণ করা হয়েছে:

সারণী ১: গবেষণা এলাকা

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা/থানা	ইউনিয়ন/ওয়ার্ড	গ্রাম/মহল্লা/রোড
১	মাদারীপুর	কালকিনি	নবগ্রাম	শশিকর
			লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর
২	মানিকগঞ্জ	শিবালয়	আরিচাঘাট	আরিচাঘাট
			আরিচা	অম্বয়পুর
৩	বরিশাল	সদর	সদর	সদররোড
৪	ঢাকা	কাফরুল	কাফরুল	দক্ষিণ কাফরুল
		মোহাম্মদপুর	মোহাম্মদপুর	মোহাম্মদপুর

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

গবেষণায় প্রাইমারী এবং সেকেন্ডারী উভয় ধরনের তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাইমারী তথ্য সংগৃহীত হয়েছে উল্লিখিত এলাকার নির্বাচিত উত্তরদাতাদের কাছ থেকে। অন্যদিকে সেকেন্ডারী তথ্য নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ, আইন গ্রন্থ, ইতিহাস গ্রন্থ, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিল, হিন্দু পারিবারিক আইন, দৈনিক পত্রিকা, মাসিক পত্রিকা, বিভিন্ন সংস্থার সভা-সেমিনারের দলিল এবং বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে। প্রাইমারী তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে পি আর এ পদ্ধতি (অংশগ্রহণ মূলক পদ্ধতি) অনুসরণ করা হয়েছে। নমনীয় প্রশ্নপত্র/চেকলিস্ট) যেমন- ক) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার; খ) ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও গ) সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

নিম্নে পি আর এ পদ্ধতির মাধ্যমে যেভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তা বর্ণনা করা হল:

Dhaka University Institutional Repository

প্রধান তথ্য দাতা বা Key Informants:

প্রধান তথ্যদাতারা যারা গবেষণা বিষয়টি সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকেবহাল বা যারা ভুক্তভোগী তাদেরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে তথ্য সংগ্রহ করা হযেছে। হিন্দু সধবা এবং বিধবা নারী, হিন্দু নেতা, এলিট শ্রেণী, সরকারী কর্মকর্তা, ধর্মীয় প্রতিনিধি/পুরোহিত, আইনজীবি, এবং নারী নেত্রীদের সাথে আলাদা ভাবে সাক্ষাৎকার এবং কেইস স্টাডির মাধ্যমে মতামত গ্রহণ করা হয়েছে । তথ্য সংগ্রহের জন্য কিছু নমনীয় প্রশ্নপত্র তৈরি করে বিভিন্ন এলাকার হিন্দু নারীদের সাথে আলোচনা করে প্রাথমিক ধারণা লাভ করা হয়। প্রাথমিকভাবে মাঠ পরিদর্শনের পর হিন্দু নারী এবং অভিজ্ঞমহলের জন্য একটি পুর্ণাঙ্গ নমনীয় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়। পরে এই প্রশ্নপত্রগুলোর উপযুক্ততা যাচাই করা হয়। পাশাপাশি এই প্রশ্নপত্রগুলো কয়েকজন গবেষক ও সমাজ সংস্কারক যারা এই বিষয় সম্পর্কে ভাল জানেন তাদের কাছে দেওয়া হয় এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয়েছে। সধবা বিধবা নারীর কাছ থেকে তথ্য নেওয়ার সময়ে রেন্ডম পদ্ধতিতে বিধবা এবং সধবাদের (যাদের স্বামী বর্তমান এবং যাদের বিবাহিত জীবনের বয়স দুই হতে বিশ বছর পর্যন্ত) কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গ্রাম পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালে এলাকার প্রবীণদের সাথে আলোচনা করে মতামত নেওয়া হয়েছে। সধবা এবং বিধবাদের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়েছে । প্রধান তথ্যদাতার কাছ থেকে তথ্য নেওয়ার উদ্দেশ্য হল: হিন্দু নারীর জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে জানা, হিন্দু নারীর অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কে জানা, হিন্দু ধর্মের পারিবারিক প্রথা, রীতি, নিয়ম, আইন, পারিবারিক ঐতিহ্য, সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা, সরকারের ভূমিকা, ধর্ম সংস্কারকের অবস্থান, হিন্দু নারীর জীবন পদ্ধতির উন্নয়ন সম্পর্কে তাদের আগ্রহ, বিভিন্ন দেশের হিন্দু আইনের সাথে বাংলাদেশের আইনের বৈষম্য এবং কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায় সে সম্পর্কে জেনে নেওয়া।

সারণী ২: যাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে :

ক্রমিক নম্বর	প্রধান তথ্যদাতা	সংখ্যা
১	সধবা হিন্দু নারী	১০০ জন
২	বিধবা হিন্দু নারী	১০০ জন
৩	আইন জীবি	৫ জন
৪	রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ	৫ জন
৫	শিক্ষাবিদ	৭ জন
৬	নারী নেত্রী	৬ জন
৭	ধর্মীয় প্রতিনিধি ও নেতা	৫ জন
৮	মোট	২২৮ জন

প্রধান তথ্য দাতাদের কাছ থেকে যেভাবে এবং যেসব তথ্য নেওয়া হয়েছে:

সধবা

মাঠ পরিদর্শনের সময়ে সধবা নারীর বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিবাহিত জীবনের বয়স, সন্তান সংখ্যা, পরিবারে বা পরিবারের বাইরে কোন ধরনের কাজ করেন। পরিবারের অন্যরা তার সাথে কেমন আচরণ করেছে, পরিবারের ধরণ

Dhaka University Institutional Repository

কেমন, বাবার বাড়িতে এবং স্বামীর বাড়িতে সদস্য সংখ্যা কত, সন্তানদের ক্ষেত্রে তার কোন মতামত আছে কিনা, সন্তানরা কে কি করছেন, পরিবারে তার নিজস্ব কোন সম্পত্তি রয়েছে কিনা, সে সম্পত্তি তিনি ব্যবহার করেন কিনা, বিবাহের সময়ে তিনি যে স্ত্রীধন পেয়েছে তা কে ব্যবহার করে, বাবার বাড়িতে কোন দায়িত্ব পালন করছে কিনা, করলে কোন ধরনের দায়িত্ব পালন করছেন, পরিবারে বিধবা নারীর প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি কি তা জেনে নেওয়া এবং ব্যাক্তিজীবনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে ওয়াকেবহাল হওয়া।

বিধবা

বিধবা তথ্য দাতার ক্ষেত্রে তার বর্তমান অবস্থান করছেন, বয়স, শিক্ষগত যোগ্যতা, সন্তান সংখ্যা, বিবাহিত জীবনের বয়স, বৈধব্য জীবনের বয়স, পরিহিত পোশাক, পরিবারে তিনি কি কি কাজ করে থাকেন, কি কি বা কোন ধরনের সুবিধা ভোগ করে এর কারণ কি ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। যেমন পরিবারে তার মতামতের কোন মূল্য আছে কিনা। বাড়িতে তিনি কোন ঘরে অবস্থান করেন। বর্তমানে তার পরিবারের খরচ কিভাবে চলে। বাবার বাড়ি হতে কোন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি পেয়েছেন কিনা, যদি পেয়ে থাকেন তবে সে সম্পত্তি কে বা কারা ব্যবহার করেন। সন্ত ানদের ক্ষেত্রে কার মতামত গ্রহণ করা হয়। সংসারের কোন কোন ক্ষেত্রে তার মতামত নেওয়া হয় । হিন্দু পারিবারিক আইন সম্পর্কে কতটা জানেন ইত্যাকার বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়েছে।

আইনজীবি

যেসব আইনজীবি হিন্দু আইন সম্পর্কে ভাল জানেন এবং হিন্দু আইন নিয়ে আদালতে কাজ করেন তাদের মতামত নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছ থেকে হিন্দু পরিবারিক আইন এবং ভারতের হিন্দু আইন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া কিভাবে হিন্দু আইন সংস্কার করা যায় বা যুগোপযুগী আইন তৈরী করা যায় সে সম্পর্কে মতামত নেওয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ

হিন্দু পারিবারিক আইন সম্পর্কে রাজনৈতিক নেতারা কতটা ওয়াকেবহাল, এই আইন পরিবর্তনে তাদের মনোভাব কি এবং এই আইন সংস্কারে বাধা কোথায় সে সম্পর্কে জানা।

শিক্ষাবিদ বা এলিট শ্রেণী

হিন্দু নারী সম্পর্কে এলিট শ্রেণীর মতামত নেওয়া হয়েছে। এখানে বর্তমান হিন্দু নারীর অবস্থান সম্পর্কে তাদের ধারণা কি সে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল। নারীর ক্ষমতায়নের যুগে হিন্দু নারীর অবস্থান পরিবর্তনের ব্যাপারে তাদের ধারণা কি

Dhaka University Institutional Repository

এবং হিন্দু আইনের সংস্কারে তারা কোন ভূমিকা রাখতে পারেন কিনা, ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে তাদের ভাবনা কি সে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়।

নারী নেত্রী

উত্তরাধিকার বঞ্চিত হিন্দু নারীর আর্থ সামজিক অবস্থা জানতে নারী নেত্রীদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। তাদের মতামত কি, হিন্দু নারীর অধিকার রক্ষার্থে তাদের ভূমিকা কি, নারী হিসেবে তারা হিন্দু নারীর অধিকারগুলোকে কিভাবে দেখে থাকেন, নারীর ক্ষমতায়নে হিন্দু নারীর আর্থ সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণে নারী নেত্রীদের ভূমিকা কি সে সম্পর্কে জানা।

ধর্মীয় নেতা/ প্রতিনিধি

ধর্মীয় গ্রন্থ ও হিন্দু আইনে হিন্দু নারীর অবস্থান কি, হিন্দু আইনের সংস্কার সম্পর্কে তাদের মতামত কি, হিন্দু নারীর অর্থনৈতিক জীবন সর্ম্পকে তাদের মতামত কি, কিভাবে এর পরিবর্তন আনা যায়, বৈদিক যুগের আইনকে কিভাবে যুগোপযুগী করা যায়, আইন সংস্কারে বাধাঁ কোথায় ইত্যাদি বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সরেজমিন পরিদর্শন

পরিদর্শন গুণগত গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের সময়ে তথ্যদাতার অবস্থান, বয়স, বাচনভঙ্গি, আচরণ, পোশাক ও ব্যবহৃত জিনিসপত্র, পরিবারের অন্যদের সাথে তার আচরণ, পারিবারিক সম্পর্ক, তথ্যদাতার সাথে পরিবারের অন্যদের আচরন, মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা, আর্থিক অবস্থা ইত্যাকার বিষয়গুলো লক্ষ্য করা হয়েছে। এই বিষয়াবলী তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থান নির্নয়ে সহায়তা করেছে।

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

গ্রুপ আলোচনা হচ্ছে এমন একটি বিষয় যার মাধ্যমে যে কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে একটা গতিশীল ধারণা প্রদানে সহায়তা করে। গ্রুপ আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্য, ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে তুলনা করা যায় এর মাধ্যমে এই দুইয়ের পার্থক্য বা দ্বন্দ্ব যার ভিত্তিতে পুনরায় অনুসন্ধান করা যায় (টাউন্সলী, পৃ:. ১৯৯৩)। মাঠ গবেষণার নির্ধারিত গ্রাম এলাকায় কেইস স্টাডি গ্রহণের সময়েই দু'টি করে (সধবা এবং বিধবা) অলাদাভাবে তাদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণ কৌশল

মাধ্যমিক তথ্য বিশ্লেষণ

যে সমস্ত হিন্দু ধর্ম গ্রন্থ রয়েছে সেগুলি হতে বিষয় ভিত্তিক অংশকে অলাদা করে কোডিং এর মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবত গীতা, রামায়ন, মহাভারত, সংহিতা, বেদ, চন্ডী ইত্যাদি ধর্মীয় গ্রন্থগুলোতে হিন্দু ধর্মীয় নিয়ম কানুন

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে কি বলা হয়েছে সেম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং হিন্দু আইনের বিভিন্ন বই, ভারতে প্রবর্তীত হিন্দু নারীর আইনগত অধিকার কি রয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রচলিত আইনের সাথে মিল রেখে গবেষণায় হিন্দু নারীর ধর্মীয় ও আইনগত অধিকারের দিকটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রাথমিক তথ্য বিশ্লেষণ কৌশল-

এই গবেষণায় গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় ধরনের তথ্যই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মাঠ পরিদর্শন শেষে তথ্যগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রশ্নপত্র এবং প্রাপ্ত তথ্য কোডিং করে আলাদা করা হয়েছে। এর পরে টেবুলেশনের মাধ্যমে তথ্যকে সাজানো হয়েছে। পরে এর ভিত্তিতেই গবেষণা হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ২

মাধ্যমিক তথ্য পর্যালোচনা

ক. হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে নারীর অবস্থান

খ. হিন্দু পারিবারিক আইনের উৎস

গ. হিন্দু পারিবারিক আইনে নারীর অধিকার: বাংলাদেশ ও ভারতের তুলনামূলক চিত্র

যে কোন গবেষণার জন্য মাধ্যমিক তথ্য (সেকেন্ডারী ইনফরমেশন) বা সাহিত্য পর্যালোচনা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষকরে গবেষণা বিষয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ, কাঠামো নির্মাণ, চেকলিস্ট তৈরি এবং তথ্য বিশ্লেষণের জন্য বিদ্যমান মাধ্যমিক তথ্য বা সাহিত্য পর্যালোচনা অতি জরুরী। এই গবেষণায় বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ, আইনগ্রন্থ, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ মাধ্যমিক তথ্যের উৎস হিসেবে কাজ করেছে। এ গবেষণায় গ্রন্থতথ্য পর্যালোনার তিনটি দিক রয়েছে যেমন: ১) লিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে হিন্দু নারীর অবস্থান চিত্রন, ২) হিন্দু আইনের উৎস সন্ধান ও ৩) বাংলাদেশে হিন্দু আইনের স্বরূপ ও হিন্দু অধ্যুষিত পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা।

ক. হিন্দু ধর্মগ্রন্থে নারীর অবস্থান

হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থাবলী আসলে প্রাচীন কালের মুনি ঋষিদের সাধনালব্ধ জ্ঞানের প্রকাশ। মুনী ঋষি ও রাজাধিরাজ এর জীবন ও কর্মকে কেন্দ্র করে রচিত কাহিনী ও নীতিকথাই এই ধর্মের গ্রন্থাবলীর প্রতিপাদ্য। শত সহস্রাব্দ বছরের পুরনো এই ধর্মীয় ব্যবস্থার একক কোন প্রবর্তক নেই। বহুজনের জীবন ও কর্ম নির্ভর এই ধর্মের বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ এবং কাহিনী হতে নারী সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা উপস্থাপন করা হলঃ

Dhaka University Institutional Repository

বেদঃ

হিন্দু ধর্মের প্রাচীনতম মৌলিক গ্রন্থ বেদ। প্রখ্যাত বেদভাষ্য রচয়িতা সায়ণাচার্যের মতে,"ইষ্টপ্রাপ্তানীষ্টপরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং যো গ্রন্থো বেদয়তি স বেদঃ।" অর্থাৎ, ইষ্ট প্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের অলৌকিক উপায় যার থেকে জানতে পারি তাই বেদ। এর মধ্যে হিন্দুদের সকল ধর্মের উৎস, সকল ধর্মের মীমাংসা ও সকল জ্ঞানের পরিণতি খুঁজে পাওয়া যায়। *(বন্দ্যোপাধ্যায়, বাং- ১৩৯৫; অবতরনিকাঃ পৃষ্ঠা. ক)*

বৈদিক সমাজে নারী জাতির বিশেষ অবস্থান ছিল। ঋক্‌বেদের ১/১৩১/৩ মন্ত্রে বলা হয়েছে "হে ইন্দ্র, তোমার সেবক এবং পাপদ্বেষী যজমান দম্পতি একত্রে বসে তোমার তৃপ্তির অভিলাষে অধিক পরিমান হব্যদান[২] করে তোমার উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক গোধন লাভের জন্য যজ্ঞ বিস্তার করেছে।" আবার ঋক্‌বেদেরই ৫/৪৩/১৫ মন্ত্রে বলা হয়েছে "পরিনীত[৩] দম্পতি একত্রে বসে প্রচুর হব্যদান করছে।" এই সময়ে নারীর কেবল একত্রে বসে যজ্ঞ[৪] করার অধিকারই নয় নারী ঋষি সমতুল্য হয়ে বেদের মন্ত্র, সংকলন এবং রচনারও অধিকারী ছিলেন। এর প্রমাণ মেলে ঋক্‌বেদের পঞ্চম মন্ডলের ২৮ নং সুক্তে (মন্ত্র) । এই সুক্তের[৫] রচয়িতা হলেন বিশ্ববরা নামের একজন নারী । এ সঙ্গে অত্রি -দুহিতা অপলা (৮/৯৬/১), কক্ষীবানের দুহিতা ঘোষা (১০/৩৯/৭, ১০/৪০/১) অগস্ত্যের পত্নী লোপা মুদ্রা (১/১৭৯/১-৫), সাবিত্রী সুর্যা- (১০/৮৫/১-৪৭), অম্ভৃন কন্যা বাক্‌ (১০/১২৫/১-৮) এবং ইন্দ্রের পত্নী ইন্দ্রানী (১০/১৪৫/১-৬) নাম স্মরণ যোগ্য। কয়েক হাজার বছর পুর্বে নারী জাতির এ অবস্থান আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

ঋক্‌বেদেরই আবার অন্যত্র ১০/৩৪/১ সুক্তে উল্লেখ আছে "আমার রূপবতী পত্নী কখনও আমার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করেনি, কিন্তু কেবল মাত্র পাশার অনুরোধে (জুয়া-খেলায়) আমি সে পরম অণুরাগিনী ভার্যাকে ত্যাগ করিলাম।" এখানে উল্লেখ্য যে মহাভারতে রাজা যুধিষ্ঠীর দুর্যোধনের সাথে পাশা খেলে নিজ স্ত্রী দ্রৌপদীকে সম্পদ তুল্য মনে করে বাজি ধরেছিলেন। বেদের এই বৈপরিত্যের সুযোগে ঋষিগণ তাদের সংহিতায় নারীর উপর চরম বিধি নিষেধ আরোপ করে যা হিন্দু আইন বা Code of Hindu Life হিসেবে প্রচার করেছেন। আর যুগ যুগ ধরে এই আইন হিন্দু সমাজে প্রচলিত রয়েছে।

মনু সংহিতা (The Code or Institutes of Manu):

হিন্দু সমাজে যত ধর্ম সংহিতা প্রচলিত রয়েছে তাদের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে মনুসংহিতা। গুরু আচার্য বৃহস্পতি বলেন, "বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যং তু মনোঃ স্মৃতম্‌॥" অর্থাৎ, বেদেই মনুসংহিতার ভিত্তিভূমি (শাস্ত্রী, ১৯৯৪ঃ পৃ.প্রস্তাবনা ১)। মনু সংহিতার পরেই রয়েছে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ও উপনিষদ। মনু সংহিতায় নারীর মর্যাদা নিরূপনের ক্ষেত্রে মনুর নেতিবাচক

---

[২] হব্যদান- ঘি মেশানো ভাত

[৩] পরিনীত- প্রাপ্ত বয়স্ক

[৪] যজ্ঞ- ঈশ্বরের তুষ্ঠ কামনায় খড়ি দিয়ে জ্বালানো অগ্নিতে ঘি, ফুল, চন্দন দিয়ে আহুতি প্রদান

[৫] সুক্ত- মন্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

মনোভাব মনোভাব প্রকাশ পায়। মনু সংহিতার নবম অধ্যায়ে তার বলিষ্ট ঘোষণা - নারী স্বাতন্ত্র্য লাভের যোগ্য নহে। স্বামীকে নির্দেশ দিয়েছেন নারী যেন কারো রক্ষণাবেক্ষণে থাকে। নারী সম্পর্কে তিনিই আবার বলেছেন 'যত্র নার্যস্ত পুজন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ অর্থাৎ যেখানে নারীর পূজা হয় সেখানেই দেবতার পূজা হয়। শাস্ত্রের বিধান অনুসারে স্ত্রী জাতির যাগকর্মাদি সংস্কার মন্ত্র দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না- এজন্য চিত্ত বিশুদ্ধ হয় না- স্মৃতি, বেদাদি শাস্ত্রে ইহাদের কোন অধিকার নেই। এইজন্য ইহারা অত্যন্ত হীন ও অপদার্থ। এর পরেই মনু স্ত্রীলোকের ব্যভিচার দোষের বর্ননা করেছেন (শাস্ত্রী, ১৯৯৪: পৃ.প্রস্তাবনা ৪)।"

হিন্দু নারী যে পুরুষের হাতের ক্রীড়নক তার প্রমাণ পাই মনুসংহিতায় (শাস্ত্রী, ১৯৯৪; পৃ.৩৮)। দ্বিতীয় সর্গের শ্লোক ৬৭নং এ "বিবাহই স্ত্রী লোকদেও বৈদিক উপনয়ন। পতির সেবাই তাদের গুরুকুলে বাস এবং গৃহকর্মই প্রভাতে ও সন্ধ্যায় হোমস্বরূপ অগ্নি পরিচর্যা ।"

হিন্দু নারী যে কখনোই স্বাধীন নয় তা মনু সংহিতার নবম অ্যধ্যায়ের নবম ১৪৮ নম্বর শ্লোকে (শাস্ত্রী, ১৯৯৪; পৃ.৩৭৫) স্পষ্ট হয়:

"বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রানাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভেজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্।।"

অর্থাৎ, নারী বাল্যাবস্থায় পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন, স্বামীর মৃত্যু হলে পুত্রের অধীন – কখনও স্বাধীনভাবে বাস করবেন না। মনুর এই ব্যবস্থা পুরুষ শাসিত সমাজের চরম ব্যবস্থা এবং নারীদেরকে চরম অপমানিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে মনু খুব রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নারীর নেতিবাচক অবস্থানের পাশাপাশি কোথায় কোথও ইতিবাচক অবস্থানের কথাও উল্লেখ করেছেন; যেমন: নিত্যমাস্যং শুচিঃ স্ত্রীণাং অর্থাৎ স্ত্রীলোকের মুখ সর্বদাই পবিত্র (শাস্ত্রী, ১৯৯৪; পৃ.২১৪, শ্লোক ১৩০. ৫ম সর্গ)।

এখানে উল্লেখ্য যে মনুর বিধান অনুসারে বিবাহের জন্য মেয়ের বয়স আট এবং ছেলের বয়স ২৪। বিয়ের বয়সের দিকে আবার মনুর সাথে স্মৃতিকারগণ মেয়েদেরকে পাঁচভাগে বিভক্ত করেন প্রথম নগ্নিকা অর্থাৎ যখন সে নগ্ন থাকে, দ্বিতীয় গৌরী অর্থাৎ আট বছরের মেয়ে, তৃতীয় রোহিনী অর্থাৎ নয় বছরের মেয়ে , চতুর্থ কন্যা, অর্থাৎ দশ বছরের মেয়ে, এবং ৫ম রজস্বলা অর্থাৎ দশ বছরের মেয়ে। মনুর বিধান অনুসারে মেয়ের বিবাহ দিতে হবে রজস্বলা/ঋতুমতি হবার আগে অর্থাৎ হিন্দু মেয়ের জন্য বাল্য বিবাহই ছিল নির্ধারিত। হিন্দু নারীর অবিবাহিত থাকার কোন বিধানও নেই। এ সম্পর্কে মহাভারতে বর্ণিত মহাতপামুনীর কন্য শুভ্রার কাহিনী তাৎপর্যপূর্ণ। বহুবর্ষ তপস্যার পর শূভ্রা স্বর্গে যেতে চাইলে নারদ তাকে জানালেন অনূঢ়া কন্যার স্বর্গে যাবার বিধান নেই। ফলে মুমূর্ষু শুভ্রা গালবমুনীর পুত্র প্রাকশৃঙগকে বিয়ে করেন। হিন্দু শাস্ত্রে ব্যক্তি বা স্ত্রী কোন হিসেবেই নারীর মূল্য নেই (হুদা ও অহিদুজ্জামান, ২০০১, পৃ.১৪৭)। সনাতন ঋষিদের সংজ্ঞায় স্ত্রী স্বামীর

Dhaka University Institutional Repository

অস্থাবর সম্পত্তি। মনু সংহিতা অনুসারে বিয়েতে যে বাগদান করা হয় তাতেই নারীর উপর পতির স্বামীত্ব জন্মে, সুতরাং স্বামী সেবাই স্ত্রীর কর্তব্য (শাস্ত্রী, ১৯৯৪; পৃ.২১৯)। আবার মনু সংহিতায়ই রয়েছে যে, ত্রীনি বর্ষান্যুদীক্ষেত কুমার্য্যতুমতী সতী। ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম। অর্থাৎ কুমারী ঋতুমতী হলেও তিন বৎসর গুণবান বরের জন্য অপেক্ষা করবে এবং ঐ সময় অতিক্রান্ত হলে কন্যা নিজের যোগ্য পতি নিজই মনোনীত করবে (শাস্ত্রী, ১৯৯৪; পৃ.৯৯৩, শ্লোক ৯০, নবম সর্গ)। মনু সংহিতার ৩য় সর্গের শ্লোক ৫৫ এ আরো উল্লেখ রয়েছে, যে পরিবারে নারীগণ সম্মানীত হন সেখানে দেবগণ প্রসন্ন থাকেন-আর যেখানে নারীগণের সমাদর নেই সেখানে যাগাদি ক্রিয়াকর্ম সমস্তই ব্যর্থ হয়ে যায় (শাস্ত্রী, ১৯৯৪; পৃ.৮৬, শ্লোক ৫৬, ৩য় সর্গ) ।

মনু সংহিতার যে সকল শ্লোকে নারীর অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

শ্লোক ২১৩, দ্বিতীয় সর্গঃ	ইহলোকে পুরুষদের দুষিত করাই নারীদের স্বভাব। সুতরাং পন্ডিতগণ নারীদের সম্পর্কে কখনো অসতর্ক হন না।
শ্লোক ৬৭, দ্বিতীয় সর্গঃ	বিবাহই স্ত্রী লোকদের বৈদিক উপনয়ন। পতির সেবাই তাদের গুরুকুলে বাস এবং গৃহকর্মই প্রভাতে ও সন্ধ্যায় হোমস্বরূপ অগ্নি পরিচর্যা ।
শ্লোক ৮৭, ৩য় সর্গ :	যারা নিজেদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন, বিভিন্ন সৎ কার্যের অনুষ্ঠানে এবং উৎসব প্রভৃতি ভোজন, বস্ত্র ও অলঙ্কারে নারীর সমাদর করা তাদের অবশ্য কর্তব্য। মন্তব্যঃ নারী কেবল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বিশেষ ও ভোগের সম্পত্তি বলে বিবেচিত
শ্লোক ৮৭, ৩য় সর্গঃ	বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত না থাকলে স্ত্রী স্বামীর প্রীতি জন্মাতে পারেনা। আবার স্বামীর প্রীতি জন্মাতে না পারলেও সন্তানোৎপাদন হয়না
শ্লোক ৫৭, তৃতীয় সর্গ :	যে পরিবারে নারীগণ সর্বদাই দুঃখিত থাকেন সেই কুল শীঘ্রই বিনষ্ট হয়-- যে পরিবারে নারীদের কোন দুঃখ নেই সেই পরিবারে সর্বদাই শ্রীবৃদ্ধি ঘটে থাকে।
শ্লোক ১৪৯, পঞ্চম সর্গঃ	নারী পিতা, স্বামী বা পুত্রের সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে কখনও ইচ্ছে করবেন না। কারণ এদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকলে তিনি পিতৃকুল এবং পতিকুল উভয়ই কলঙ্কিত করবেন। মন্তব্যঃ স্বাধীনতা দিলেই নারী সর্বনাশ ডেকে আনবে এই আশঙ্কায় মনু তার (নারী) চিরজীবনের অভিভাবক স্থির করে দিয়েছেন নরকে।
শ্লোক ১৫২ পঞ্চম সর্গঃ	বিবাহে যে স্বস্ত্যয়ন (শান্তির জন্য যে মন্ত্র পাঠ করা হয়) প্রজাপতি যজ্ঞ করা হয় সেই সবই স্বামী ও স্ত্রীর মঙ্গলার্থে। তাছাড়া বিবাহে যে বাগদান করা হয় তাতেই নারীর উপর পতির স্বামীত্ব জন্মে। সুতরাং স্বামীর সেবা করা নারীর কর্তব্য।
শ্লোক ১৫৪, পঞ্চম সর্গ :	পতি সদাচার শূন্য, পরদার রত বা গুনহীন হলেও স্বাধ্বি স্ত্রী স্বামীকে দেবতার মতো পূজা করবেন। মন্তব্য-মনুর এই একদর্শিতা কোনক্রমেই সমর্থন করা চলেনা । মনুই বলেছেন- "যত্র পর্যান্ত

Dhaka University Institutional Repository

	পুন্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা" এই কি নারী পূজা? সেই যুগে অপদার্থ পতিদেবতাদের দন্ডদাতা কেউ কি ছিলনা?
শ্লোক ১৫৫, পঞ্চম সর্গ :	রমনীদের স্বামী বিনা পৃথক সঙ্গ নেই । পতির অনুমতি ভিন্ন কোন ব্রত বা উপবাস নেই । একমাত্র স্বামীর সেবার সাহায্যেই তিনি স্বর্গলাভ করবেন। মন্তব্য: নারী মনুষ্যত্বের চরম অপমান।
শ্লোক ১৫৭, পঞ্চম সর্গ:	পতির মৃত্যু হলে স্ত্রী বরং পবিত্র পুষ্প ফুল মূল দ্বারা অল্পহারে দেহ ক্ষয় করবেন তবু পর পুরুষের নামোচ্চারন করবেন না।
শ্লোক ১৬৮, পঞ্চম সর্গ:	ভার্য্যার (স্ত্রী) আগে মৃত্যু হলে ধার্ম্মিক ব্রাক্ষন স্বামী অগ্নি হোত্র অঙ্গের অগ্নি ও অঙ্গপাত্রের দ্বারা তার দাহকার্য এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করে পুরুষ পুর্নবার বিবাহ ও অগ্ন্যাধ্যান করবে। মন্তব্য: মনু নারীর জন্য কঠোর ব্রক্ষচর্য্যের বিধান দিয়ে পুরুষের বিবাহের বিধান দিয়ে দিলেন/ ব্রক্ষচর্য কি কেবল নারীদেরই জন্য?
শ্লোক ৩ ৯ম সর্গ:	নারী বাল্যাবস্থায় পিতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন, স্বামীর মৃত্যু হলে পুত্রের অধীন – কখনও স্বাধীনভাবে বাস করবেন না। মন্তব্য: মনুর এই ব্যবস্থা পুরুষ শাসিত সমাজের চরম ব্যবস্থা এবং নারীদেরকে চরম অপমানিত করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র: শ্রী সুরাজি মোহন শাস্ত্রী, মনু সংহিতা, কোলকাতা, ১৯৯৪, দিপালী বুক হাউজ প্রকাশিত বই হতে তৈরীকৃত।

রামায়ণ:

রামায়নের পুরো কাহিনী রামকে কেন্দ্র করেই। এই গ্রন্থ হতে নারীর স্বরূপ যেভাবে পাওয়া যায় তার আলোকে বলা যায় যে এই সময়ে পুরুষের বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। কেননা স্বয়ং রাজা দশরথের তিন স্ত্রী বতর্মান ছিল। তবে উল্লেখ্য যে এখানে নারীর সম্মান ছিল দেবী রূপে। এই দেবী ছিল কামনার দেবী। রাময়নে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে স্বয়ংম্বর প্রথারও উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে ভ্রাতৃজায়াকে বিয়ে করাও যে রীতি ছিল তা সুগ্রীব কর্তৃক মৃত জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালীর স্ত্রী তারাকে বিয়ের মাধ্যমে দেখা যায়। আবার রামায়নের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই যে রাজা দশরথ পুত্র কামনায় যজ্ঞের আয়োজন করেন। রাময়নেই রামের সরূপ বর্ণনায় নারদ বলেন শতভাগ সুবর্ণ এবং কোটি কন্যা দান তথাপি না হয় রামের সমান। অর্থাৎ শতভাগ সোনা এবং কোটি কন্যাও রামের সমান নয়। রামায়নের অযোধ্যাকান্ডের[৬] ৬২/৮ নং শ্লোকে যা বলা হয়েছে- ভার্যা তু খলু নারীনাং গুনবান্ নির্গুনোহপি বা। ধর্ম বিমৃশমানানাং প্রত্যক্ষং দেবি দৈবতম্ । অর্থাৎ পতি গুনবানই হোক আর নির্গুণই হোক স্ত্রী লোকের তিনিই দেবতা। আবার যুদ্ধকান্ডের রাবন নিধনের পরে যখন সীতা আনন্দে উৎফুল্ল চিত্তে প্রতীক্ষিত রামের সঙ্গে মিলনের জন্য উৎগ্রীব রাম সকাশে আগমন করেন. তখন সতীত্বের প্রশ্নে রাম অযৌক্তিকভাবে সীতাকে অগ্নি পরীক্ষা দিতে বলেন এবং এই বলে অগ্নি পরীক্ষায় বাধ্য করেন, "ভদ্রে ময়ৈত্য কৃতবুদ্ধিনা। লক্ষ্মণে বাথ ভরতে কুরু বুদ্ধিং যথাসুখম্।। শত্রুঘ্নে বাথ সুগ্রিবে রাক্ষসে বা বিভীষণে। নিবেশয় মনঃ সীতে যথা বা সুখমাত্মীন

[৬] অযোধ্যাকান্ড-অযোধ্যা অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

(১১৫/২২-২৩) অর্থাৎ, আমি মনস্থির করেছি- লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব বা বিভীষণ যাকে ইচ্ছা কর তার কাছে যাও, বা তোমার যা অভিলাষ তা স্বচ্ছন্দে কর।" সীতা রূপ নারীর প্রতি স্বয়ং রামের এরূপ ব্যবহারের কারণে এটা ছিল নারীর প্রতি পুরুষের চরম অবমাননা।

মহাভারতঃ

মহাভারতের মূল কাহিনীতে নারীর উপস্থিতিকে বিভিন্নভাবে দেখা হয়েছে । এখানেও নারী কখনো দেবী, কখনো ভোগ বিলাসের পাত্রী, কখনো স্ত্রী, কখনো মা, কিন্তু কখনই অন্তঃপুরের বাইরে নয়। মহাভারতে নারী এবং পুরুষ উভয়েরই বহুবিবাহ লক্ষ্যণীয়। মহাভারতের বর্ণনা অনুসারে প্রাচীন ভারতে বহুপতি গ্রহণ, নিয়োগ প্রথা এবং নারীদের পুর্নবিবাহের প্রচলন ছিলো। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে, অধিকতর গুণ বিশিষ্ট পাত্র পাওয়া গেলে দত্তা কন্যাকে আবার দ্বিতীয়বার দান করা যেতে পারে। পরবর্তীতে নারীর সতিত্বের প্রশ্নে হিন্দু সমাজে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়। উল্লেখ্য যে, হিন্দু বিবাহ রীতিতে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রক্ষস ও পৈশাচ বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। হিন্দু বিবাহের এসকল ধরণ এবং রীতি সম্পর্কিত আলোচনা হতে দেখা যায় শুধুমাত্র গান্ধর্ব বিবাহ ছাড়া অন্য সকল বিবাহেই নারী কোথাও দান কৃত, কোথাও বিক্রিত এবং কোথাও অপহৃত। একমাত্র গান্ধর্ব মতেই পাত্র পাত্রী স্বাধীনভাবে স্বামী স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে পারে।

বাংলাদেশের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত পরিবারে ব্রহ্মমতে বিবাহ হয়ে থাকে। এটি সাধারনভাবে দান বিবাহ নামে পরিচিত। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও গরীব শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় পন বিবাহ। কন্যাপক্ষ কর্তৃক বরপক্ষকে যৌতুক প্রদানের বিধান হিন্দু আইনে অনুমোদিত চার ধরনের বিয়েতে প্রচলিত রয়েছে।

শ্রী চন্ডীঃ

চন্ডী হিন্দু সম্প্রদায়ের আর একটি ধর্ম গ্রন্থ যা মার্কন্ডেয় পুরানের অন্তর্গত। চন্ডী পাঠ দেবী পূজার প্রধান অঙ্গ। চন্ডীতে নারীকে সর্বোচ্চ সম্মানে আসীন করা হয়েছে। সমস্ত চন্ডী জুড়েই দেবীর উপাসনা। চন্ডীতে নারীরূপী দেবীকে ব্রহ্ম রূপে দেখা হয়েছে। এই গ্রন্থে মহামায়া বিশ্বব্যাপিনী হলেও নারী মূর্তিতে তাঁর সমধিক প্রকাশ- এটি চন্ডীর নারায়ন স্তুতিতে উক্ত। প্রত্যেক নারীকে দেবী জ্ঞানে শ্রদ্ধা করাই পুরানের এই অংশে উল্লেখ্য। এই জন্যই হিন্দু সম্প্রদায়ের দূর্গা পুজাতে কুমারী পূজা করা হয়ে থাকে। তাইতো চন্ডীতে বলা হয়েছে,

"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

অর্থাৎ, নারী সর্ব শক্তির আধাঁররূপে চন্ডিতে প্রকাশমান।

ঋষি মার্কেন্ডের মতে, "ব্যঙ্গিনীং বর্জজ যেৎ কন্যাংকুরজসমপি রোগিনীম॥ বিকৃতাং পিঙ্গলাঙ্গেও বাচাট্যং সর্বদুষিতাম্।" অর্থাৎ, যে কন্যা সদ্বংশজাতা হইয়াও রোগিনী, বিকলাঙ্গ, বিকৃতা, পিঙ্গল বর্ণা, বাচালা বা সর্বদোষে দুষিত হয়, তাদৃশ কন্যা গ্রহণ করা সমুচিত না। (মার্কেন্ডয় পুরানঃ চৌত্রিশ অধ্যায়. ৭৪ শ্লোক) ।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীমদ্ভগবত গীতাঃ

শ্রীমদ্ভগবত গীতায় শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ চর্তুবর্ণ সমর্থন করে ৩২ নং শ্লোকে উল্লেখ করে বলেন যে, "মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেহপি স্যু পাপযোনয়্। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম।" অর্থাৎ, হে পার্থ স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্র অথবা যারা পাপযোনী সম্ভূত অন্ত্যজ জাতি তাহারাও আমার আশ্রয় লইলে নিশ্চয়ই পরম গতি প্রাপ্ত হন। (শ্রীমদ্ভগবত গীতা, ঘোষঃ ১৯৫৮; পৃষ্ঠা. ৩৮৬, নবম অধ্যায়, শ্লোক. ৩২,) বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী (নারী) ও শূদ্র যদি একটি 'পরমগোপন স্তব শোনে, তবে তারা রুদ্রলোক পায়। হিন্দু পুরানের নারীকে পুরুষের সকল কাজের সহায়িকা শক্তি বলা হয়েছে।

শায়ন ভাষ্য[7]: ঋষি শায়ন ঋক্‌বেদ ভাষ্য ৫/৬১/৮/ বলেছেন, স্বামী স্ত্রী পরস্পর একই স্বত্তার দু'টি অংশমাত্র। সকল বিষয়ে দুজনেই ভাগীদার । তাই উভয়েরই জাগতিক ও আধ্যাত্মিক সকল কাজের সমান অংশ নেয়া উচিত।

স্মৃতি শাস্ত্রে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, যাজ্ঞবল্ক্য[8] ১/১৮ শ্লোকে বলেছেন-"নারীগণ তাদের স্বামীর কথা অনুসারে চলবে। তা তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য।" অত্রি ১৩৬/৩৭ শ্লোকে বলেছেন, যে স্ত্রী স্বামীর জীবিতকালে স্বামীর পরিচর্যা ব্যতীত দেবতার উপাসনা করে, যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম করে, সে স্বামীর জীবন স্বল্পায়ু করে দেয়। সেই স্ত্রী নরকে যায়। যে স্ত্রী পবিত্র উদক গমন করতে চায় সে স্বামীর পাদদ্বয় অথবা সর্বাঙ্গ ধৌত করে সেই জল পান করবে সে পরলোকে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করবে। অঙ্গিরস[9] ৬৯ নং শ্লোকে বলেছেন- স্বামীর অবাধ্য স্ত্রীর দেওয়া অন্ন কেহ ভোজন করবে না। এইরূপ স্ত্রীকে ইন্দ্রিয় পরায়না জানবে।

এছাড়াও হিন্দু পুরাণ গ্রন্থ হতে আরো জানা যায় যে, গার্গী, খনা এরা হিন্দু ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু বারে বারেই শাস্ত্রকারা তাদেরকে বিভিন্ন কৌশলে পরাজিত করে পুরুষের অধস্তন করে রাখা হয়েছিল। তথাপিও সমাজে তাদের সম্মানের আসন ছিল।

খ. হিন্দু আইনের উৎস

সাধারণভাবে হিন্দু ধর্মীয় নিয়ম-কানুনসমূহকে বলা হয় হিন্দু আইন। হিন্দু আইন হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে উৎসারিত বিধি-বিধানের সমাহার। মূলতঃ ধর্মীয় বিধি-বিধানসমূহকেই আইন হিসেবে বিবেচনা করে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এগুলো মেনে নিয়েছে। এসব বিধান উৎসারিত হয়েছে প্রধানতঃ বেদ হতে। কেননা বেদ হচ্ছে হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। তাই হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করে বেদ হচ্ছে ঈশ্বরের মুখ নিঃসৃত বানী। কিন্তু বেদ হিন্দু আইনের উৎস

[7] শায়ন- বেদদ্রষ্টা ঋষি

[8] যাজ্ঞবল্ক্য- বেদদ্রষ্টা ঋষি

[9] অঙ্গিরস- বেদদ্রষ্টা ঋষি

Dhaka University Institutional Repository

হলেও, একমাত্র উৎস নয়। হিন্দু আইনের অন্যান্য উৎস হল : শ্রুতি,স্মৃতি, প্রথা, নিবন্ধ, পুরান, সংহিতা, বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত, ফ্যাকটাম ভ্যালেট, বিধিবদ্ধ আইন ইত্যাদি।

শ্রুতি (Smruti):

শ্রুতি হচ্ছে যা শ্রুত হয়েছে বা শোনা গিয়েছে। উপনিষদসহ বেদকে শ্রুতি বলা হয় । শ্রুতির বানী ঈশ্বরের মুখ নিসৃত বলে গণ্য হয়। বেদের উপসংহারের নাম উপনিষদ। একে বেদান্তও বলা হয়। উপনিষদে হিন্দু ধর্মের সর্বোচ্চ নীতিসমূহ বর্ণিত রয়েছে। (পাটোয়ারীঃ ১৯৯৮; পৃষ্ঠা. ৮) উপনিষদসমুহের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে শোপেনহেয়ার বলেন, "In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanishades. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death.(quoted in ibid.,p.15)। শ্রুতি মূলতঃ কোন আইন নয়; ইহা ধর্মীয় স্তোত্রের সমন্বয়ে গঠিত, যাতে ধর্মীয় আচার আচরণ, সত্যজ্ঞান এবং মানুষের মুক্তির কথা বলা হয়েছে। (মফিজুলঃ ১৯৯৮, পৃষ্ঠা.৭১)

স্মৃতি (Smriti):

স্মৃতি মানে স্মরণে রাখা। মুনি ঋষিগণ ঈশ্বরের কাছ থেকে যেসব বানী মনে রেখেছেন তাই স্মৃতি। স্মৃতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি মানুষের দ্বারা রচিত কিন্তু এর উৎস স্বর্গীয়। হিন্দু আইনের বিধান অনুযায়ী প্রধান ৩টি স্মৃতি হচ্ছে-ক) মনুসংহিতা (The Code of Institutes of Manu), খ) যাজ্ঞবল্ক সংহিতা (The Code of Institutes of Yajnavalky) গ) নারদ কর্তৃক সংকলিত বিধান (The Code of Institutes of Narada)। শ্রুতির উপর নির্ভরশীল হলেও স্মৃতিতে বাস্তব আইন বর্ণিত থাকায় আইনের উৎস হিসেবে স্মৃতির গুরুত্ব অনেক বেশী|

হিন্দু পারিবারিক আইনের অন্যান্য উৎসের মধ্যে রয়েছে; পুরান (Puranas), সিদ্ধান্ত, ব্যাখ্যা বা নিবন্ধ (Commentaries or Nibandhas) ও প্রথা (Custom)| নিম্নে এই উৎসগুলো পর্যালোচনা করা হলঃ

পুরাণ :

পুরান হলো পৌরানিক কাহিনী গাঁথা সম্বলিত গ্রন্থ । উপ পুরানসমূহ বাদেই পুরানের সংখ্যা আঠার। যেমন বিষ্ণু পুরান, ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরান, মার্কন্ডেয় পুরান, কালিকা পুরান ইত্যাদি। পুরানে রয়েছে সৃষ্টি ও রহস্যের বর্ণনা, দেবদেবীর কাহিনী এবং প্রাচীন রাজন্যবর্গ ও তাদের পালনীয় ও অনুসৃত ধর্মনীতি বিষয়ে আলোচনা।

আনেকের ধারণা শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যবর্তী সময়ে পুরান এসেছে। যাজ্ঞবল্কের মতের সমর্থনে অধ্যাপক কোলব্রুক পুরানকে ঐশী গ্রন্থের অতিরিক্ত এবং পঞ্চম পদ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু অধ্যাপক উইলসন বলেন, যে পুরানের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মনীতি সীমাবদ্ধ রয়েছে এবং তা আইনের কোন প্রমাণিক গ্রন্থ নয়। কেবলমাত্র ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত হিসেবে একে গ্রহণ করা যেতে পারে, প্রমাণ হিসেবে নয়।

ব্যাখ্যা বা নিবন্ধঃ

স্মৃতির বিধানগুলো ব্যাখ্যা করতে যেয়ে ভাষ্যকারদের মধ্যে অনেক সময়ে মতান্তর ঘটেছে। বিভিন্ন স্মৃতির মধ্যে বিরোধের ফলে যে ব্যাখ্যার উদ্ভব হয়েছে তাকে বলা হয় নিবন্ধ। ভাষ্যগুলো স্মৃতির ব্যাখ্যা হলেও পুরানো আইনকে সংশোধন করতে সহায়তা করেছে। কারণ এগুলো ব্যাখ্যার সময়ে কালের পরিবর্তন এবং ভাষ্যকারদের মধ্যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব পড়া খুবই যুক্তি সংগত। ভাষ্যকারগণ সমসাময়িক প্রচলিত রীতিনীতি সম্পর্কে আলোকপাত করায় তা অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থেও চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

প্রথা (Custom):

প্রথা বলতে বুঝায়, কোন সমাজে বা এলাকায় বা পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কোন নিয়ম কানুন। বিস্মৃত স্মৃতি হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি হিসেবে প্রথা পালিত হয়ে থাকে। কোন সামাজিক প্রথা সম্বন্ধেও প্রাচীন যুগ ক্রমবধার্বমানকাল যেহেতু কোন রকম কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি সেজন্য হিন্দু সমাজে প্রথাকে আইনের উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। প্রিভি কাউন্সিল প্রথা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "প্রথা হচ্ছে এমন একটি নিয়ম যা একটি বিশেষ পরিবারে বা একটি এলাকায় বহুদিন ধরে পালিত হওয়ার ফলে আইনে পরিণত হয়েছে। প্রথা অবশ্যই প্রাচীন, নিশ্চিত ও যুক্তিযুক্ত হতে হবে এবং আইনের সাধারণ সমালোচনার ব্যাখ্যায় অনমনীয় হতে হবে।" Hurprosad V. Sheo Dyal said to the privi council, "custom is a rule which in a particular family or in a particular district, has from long usage obtained the force of law. It must be ancient, certain and reasonable, and being in derogation of the general rules of law, must be construed strictly."(পাটোয়ারীঃ ১৯৯৮, পষ্ঠা. ১২)

বেদ ও স্মৃতি হিন্দু আইনের ভিত্তি হলেও হিন্দু সমাজ সামাজিক প্রথাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। মনু বলেন "স্মরণাতীতকালের প্রথা মানুষের জ্ঞানাতীত আইন" তার মতে "ঐশী আইনের অনুপস্থিতিতে আঞ্চলিক পারিবারিক বা জনগোষ্ঠী দ্বারা পালিত প্রথা পালন করতে পারে।" অনেকে অবশ্য লিখিত আইনের বিরোধী হলেও প্রথাকে বিনা শর্তে গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। নারদের মতে, "প্রথা শক্তিশালী আইনকেও বাতিল করে দেয়।"(ধরঃ ১৯৯৭, পৃ.১৫) তবে হিন্দু ধর্মীয় আইনে যাই থাকুকনা কেন তা কখনোই রাষ্ট্রীয় আইনের উর্ধ্বে নয় । তবে কখনো কখনো কোর্ট প্রথাকে রাষ্ট্রীয় আইনের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকে যখন কোন মামলায় ঐ আইনটি সৃষ্টি, আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঐশী গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে প্রথার উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। আধুনিক আইনে প্রথাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গণ্য করা হয়। প্রথা সাধারণতঃ তিনভাবে হয়ে থাকে ক) স্থানীয় প্রথা, খ) শ্রেণীভিত্তিক প্রথা গ) পারিবারিক প্রথা। হিন্দু আইনের এই প্রথাগুলো বৈধতার জন্য তিনটি শর্ত অপরিহার্য ১) প্রাচীনত্ব ২) অবিচ্ছিন্নতা এবং ৩) প্রমাণ

১) প্রাচীনত্বঃ

কোন প্রথাকে আইনগত বৈধতা অর্জন করতে হলে তার প্রচলন কাল সুদীর্ঘ হতে হবে। হিন্দু আইনের শাস্ত্রবিদগণ এ সময়সীমাকে কমপক্ষে শত বর্ষ ধরে নির্ধারণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে এও প্রনিধানযোগ্য যে, কোন প্রথাকে সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করতে হবে যে, এর প্রচলন কাল সম্পর্কে একশত বছর পর্যন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।

২) অবিচ্ছিন্নতাঃ

কোন প্রথার বিলুপ্তি ঘটলে তার ধারাবাহিকতা বা অবিচ্ছিন্নতা ক্ষুন্ন হয়ে যায়। ফলে বিলোপকৃত সামাজিক প্রথা আর স্বীকৃতি পায়না। কোন প্রথা কিভাবে বিলুপ্ত হয়েছে তা জানা খুব প্রয়োজনীয় না হলেও কিভাবে তা বিলুপ্ত হয়েছে এবং কি কি প্রাসঙ্গিক কারণে তা বিলুপ্ত হয়েছে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা বাঞ্ছনীয়। তবে সাময়িকভাবে কোন প্রথা বিলুপ্ত থাকলেই তা বাতিল বলে গণ্য হয়না। কোন বিশেষ এলাকার জনগণের উপর বাধ্যতামূলক হতে হবে। এটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে কোন প্রথা সহজেই বিলুপ্ত হয়না।

৩) প্রমাণ:

প্রমাণ কথাটির অর্থ বেশ জটিল। হিন্দু আইনে সাধারণ আইনের বিপরীতে প্রতীয়মান প্রথা অবশ্যই উপযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষ হবে। কোন প্রথা বারবার আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা হলে তা সাধারণতঃ আইনে অঙ্গীভুত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিটি ঘটনায় তা প্রমাণ করার প্রয়োজন হয়না *(ধর, নির্মলেন্দু: ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ১৫-১৬)* ।

436749

বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত বা নজির :

আদালত যদিও আইন প্রণয়ন করেন। কিন্তু কোন বিশেষ মামলায় বিচারকগণ আইন কি তা ব্যাখ্যা করেন, যা পরবর্তীকালে একই ধরনের মামলায় গ্রহণ করা হয়। হিন্দু আইনের অধিকাংশ বিষয়ই ইতিমধ্যে প্রিভি কাউন্সিল বা হাই কোর্টসমূহে সিদ্ধান্তিত হওয়ায় অনেক সময় উচ্চ বিচারাদালতের সিদ্ধান্তসমূহকে আইনের উৎস বলে গণ্য করা হয়ে থাকে এবং পরবর্তীকালে অনুরূপ বিষয়ের দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য করে তা আইন হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে। বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত ই হিন্দু আইন পরিবর্তনের অন্যতম পথ বলে চিহ্নিত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিধিবদ্ধ আইনসমূহঃ

প্রাচীন হিন্দু আইন পরবর্তীকালে বিধিবদ্ধ মানবীয় আইনে পর্যবসিত হয়েছে। প্রথম দিকে সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে হিন্দু আইনের উপর হস্তক্ষেপ করেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে পুরাতন হিন্দু আইন বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছে, অনেকক্ষেত্রে সংশোধিত হয়েছে, অনেকক্ষেত্রে নতুন নতুন বিধান সংযোজিত হয়েছে। এজন্য বিধিবদ্ধ আইনসমূহকে আধুনিক কালে হিন্দু আইনের প্রধান উৎস বলে গণ্য করা হয়।

ফ্যাকটাম ভ্যালেটঃ

হিন্দু ধর্মীয় আইনের অন্যতম প্রবর্তক জীমূৎবাহন ফ্যাকটাম ভ্যালেট নীতি প্রবর্তন করেন। রোমান প্রবচন 'factum valet quod fieri non debuit' অর্থাৎ করা উচিত নয় এমন কোন কাজ কেউ করলে সেটি অবৈধ বলে গণ্য হবেনা। এ নীতির সুত্র ধরে আদালত কতিপয় হিন্দু আইন কতিপয় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। ফ্যাকটাম ভ্যালেটের মাধ্যমে কতিপয় উল্লেখিত মামলা যার দ্বারা হিন্দু আইনের পরিবর্তন আনা হয়েছে তা উল্লেখ করা হল সুখলাল চাঁদ বনাম ভাই মনি ১৮৮৭, ১১ বম ২৪৭, উমা দেবী বনাম গোকুলোন্দ ১৮৭৮, ৩ সেল ৫৮৭ *(Ali Salma (BNWLA)|*

আইন সভা কর্তৃক প্রণীত আইনঃ

আধুনিক কালে আইন সভা কর্তৃক প্রণীত আইনকে হিন্দু আইনের অন্যতম উৎস বলে গণ্য করা হয়।

গ. হিন্দু আইনে নারীর অধিকারঃ বাংলাদেশ ও ভারতের তুলনামূলক চিত্র

বাংলাদেশে হিন্দু নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করতে গেলে হিন্দু পারিবারিক আইন জানা প্রয়োজন। গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতি রেখে এখানে হিন্দু আইনে নারীর অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া হিন্দু অধ্যুষিত ভারতের আইনের সঙ্গে বাংলাদেশের আইনের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশে হিন্দু আইনে নারীর অধিকারঃ

হিন্দু আইনে প্রধানত দু'টি বিধান আছে, যথা- ১) দায়ভাগ ও ২) মিতক্ষরা। বাংলাদেশের হিন্দুদের অধিকাংশই দায়ভাগ গোষ্ঠী এবং দায়ভাগ বিধানের আওতাভুক্ত।

হিন্দু নারীর উত্তরাধিকারঃ

Dhaka University Institutional Repository

দায়ভাগ মতবাদ অনুসারে জন্মসূত্রে নারীর সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করা হয়না। কেবলমাত্র কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পরই তার ওয়ারিশগণ উত্তরাধিকার সূত্রে মৃতব্যক্তির সম্পত্তিতে অধিকার লাভ করেন। শাস্ত্রকারগণ পৈত্রিক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রথমত পুত্রকেই নির্দেশ করেছেন। এ বিধানে পিতৃ অধিকারভুক্ত সম্পত্তিতে পুত্রের অধিকার বর্তায় পিতার মৃত্যুর সাথে সাথে। দায়ভাগ মতে হিন্দু নারীর উত্তরাধিকার সীমিত। ১৯৩৭ সনের হিন্দু মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার আইন পাশ হওয়ার পরে মৃত ব্যক্তির পুত্রদের সাথে বিধবা স্ত্রী ও একজন ভোগসত্ত্বের ওয়ারিশ হিসেবে সমান অংশের মালিকানা লাভ করে। এ আইনের বিধান মোতাবেক স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রী পুত্রদের সমান অংশের মালিক হন বটে, কিন্তু তাঁর এ অধিকার শুধু ভোগসত্ত্বের। উক্ত স্ত্রীর মৃত্যুর পর ঐ অংশের সম্পত্তির মালিকানা চলে যাবে মৃত ব্যক্তির পুত্র বা পিন্ড দানকারীদের উপর। তবে শর্ত থাকে যে, পূর্বে মৃত পুত্রের কোন বিধবা স্ত্রী যদি পূর্ব মৃত পুত্রের কোন জীবিত পুত্র না থাকে তাহলে পুত্রের মতো করে সম্পত্তি অর্জন করবে এবং উক্ত বিধবা স্ত্রী পুত্রের মতো করে সম্পত্তি পাবে যদি ঐ পূর্ব মৃত পুত্রের পুত্র বা পুত্রের পুত্র জীবিত থাকে (পাটোয়ারীঃ ১৯৯৮, পৃষ্ঠা .৪৩)।

মিতাক্ষরা বিধানে উত্তরাধিকারের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। ঐ নীতিমালা সারা ভারতে এক না হলেও সাধারণভাবে মিতক্ষরা মতবাদীরা মেনে চলে। মিতক্ষরা আইনে মাতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়দের উপরও উত্তরাধিকার আরোপ করা হয়েছে। এ বিধানে বাল্য বিধবা, অবিবাহিত কন্যা, বন্ধ্যা বা অপুত্রক কন্যা, মাতা, পিতার মাতা, পিতার পিতার মাতা, ভাইয়ের কন্যা, ভাইয়ের পুত্রের কন্যা ও পিতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারেন (পাটোয়ারী : ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৫৩)। মিতাক্ষর বিধানে রক্ত সম্পর্কই উক্ত কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে পিতা সম্পত্তির অধিকারী।

১. হিন্দু বিধবার উত্তরাধিকারঃ

হিন্দু আইনে নারীর সম্পত্তির অধিকার অত্যন্ত সীমিত ও জটিল। নারীরা সম্পত্তিতে কেবল মাত্র ভোগসত্ব উত্তরাধিকারী হয়। পুরুষ, অন্য পুরুষ বা নারীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার পেলে তা সম্পূর্ণ অধিকারই পান, কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে তা নয়। মহিলারা জীবনসত্ব বা ভোগস্বত্বের অধিকারী মাত্র।

কোন হিন্দু যৌথ পরিবার থেকে পৃথক হয়ে বিধবা স্ত্রী স্বামীর ত্যাজ্য বিত্তভোগী ওয়ারিশ হবেন কিন্তু স্বামীর সম্পত্তিতে উক্ত নারী নির্ব্যূঢ় স্বত্বভোগী হন না। উক্ত নারী স্বামীর সম্পত্তিতে উপস্বত্বজনিত আয়ের ভোগী হন, কিন্তু তা দান বা বিক্রি করতে পারেন না । তবে কেবলমাত্র আইনঘটিত আয়ের কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকলে বা তেমন কোন কারণ উদ্ভব হলে নারী সে সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবেন বা দায়বদ্ধ করতে পারবেন। আইনগত ভাবে এটি স্বীকৃত হলেও বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই সম্পত্তি হস্তান্তর করা সম্ভপর হয়না। ঐ নারীর মৃত্যু হলে স্বামীর সম্পত্তিতে তার কন্যার বা তার নিজের পিতৃ সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি ওয়ারিশ মালিক হবেন না। সম্পত্তিটি তখন স্বামীর ওয়ারিশের হাতে চলে যাবে । কন্যা কখনো পরবর্তী ওয়ারিশ হতে পারে যা খুবই সীমিত (ধর, নির্মলেন্দু, পৃষ্ঠা- ১২৩-১২৮, ১৯৯৭)

Dhaka University Institutional Repository

২. স্ত্রীধনের উপর অধিকারঃ

স্ত্রীধন হিন্দু আইনের সবচেয়ে কঠিন শাখা হিসেবে বিবেচিত। শাব্দিক অর্থে স্ত্রীধন বলতে মহিলার সম্পত্তিকেই বুঝিয়ে থাকে।

ঋষি মনু স্ত্রীধন বলতে বুঝিয়েছেন;

- বিবাহের অগ্নি সাক্ষীর সামনে প্রদত্ত উপহার
- নব বধূর নিজের বাড়ি হতে শ্বশুর বাড়িতে যাবার পথে প্রদত্ত উপহার
- স্নেহ ভালোবাসার নিদর্শন সরূপ প্রদত্ত উপহার
- পিতা প্রদত্ত উপহার
- মাতা প্রদত্ত উপহার
- ভ্রাতা প্রদত্ত উপহার।

বিষ্ণু প্রদত্ত তালিকায় স্ত্রী ধন বলতে আরও বলা হয়েছে;

- দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের সময়ে স্বামী স্ত্রীকে যে উপহার দিয়ে থাকেন
- বিবাহের পরে স্বামীর আত্মীয় স্বজন বা তার বাবা মার আত্মীয় স্বজন যে উপহার দিয়ে থাকেন
- শুল্ক
- পুত্র ও আত্মীয় স্বজন দেওয়া উপহার।

উপরোক্ত ভাবে প্রাপ্ত সম্পত্তির নিরঙ্কুশ ভাবে মালিক হবেন স্ত্রী বা নারী (পাটোয়ারী, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা.১৭৪)। তবে কোন হিন্দু বিবাহিত নারী যার স্বামী বর্তমান, তিনি স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী ধন কাউকে দান বা বিক্রি করতে পারবেন না।

৪. বিবাহ রেজিস্ট্রেশনঃ

হিন্দু পারিবারিক আইনে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের বিধান নেই। হিন্দু বিবাহে হোম অগ্নি মন্ত্র সমাজের ৩ স্তরের লোকের উপস্থিতিতে বিবাহ কার্য সম্পাদন করা হয়ে থাকে। যে কারণে প্রাচীন কাল থেকে ধারণা করা হয়েছিল যে, বিবাহে রেজিষ্ট্রেশন না হলেও চলবে। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে হিন্দু নারী সম্পর্কে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের কারণে বিবাহের রেজিষ্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কেননা কোন নারী যদি কোন ভাবে নির্যাতনের স্বীকার হয়ে আদালতের শরণাপন্ন হন; তখন আদালত হিন্দু আইনের একক নির্দেশনা না থাকায় সঠিক বিচার পেতে সমস্যা হয়। স্বামী কর্তৃক অস্বীকৃত হলে, আদালতে প্রমাণ করা কঠিন হয়ে পড়ে যে তিনি তার স্বামী। কখনো কখনো আইনগতভাবে ভরণপোষণ আদায় করাও কঠিন হয়ে পড়ে। বিবাহ রেজিস্ট্রেশন প্রবর্তনের মাধ্যমে বাল্য বিবাহ, অবৈধ যৌতুক গ্রহণ, একাধিক বিবাহ ইত্যাদি নারী নির্যাতনমূলক ক্রিয়াকান্ড অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে বলে মনে করা হয়। ১৮৭২ সালে বিশেষ বিবাহ আইন হিন্দু বিবাহ রেজিস্টারের মাধ্যমে করা যাবে বলে আইন পাস হয়েছে। এই আইন হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মের

Dhaka University Institutional Repository

লোকদের উপর বলবৎ হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৮৭২ সালের বিশেষ বিবাহ আইনের রেজিস্ট্রেশন স্বীকৃতি পায়নি *(ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড: ১৯৯৩, পৃষ্ঠা -৭৩)*

৫. পৃথক বসবাস বা বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার:

হিন্দু ধর্মে বিবাহ একটি ধর্মীয় ব্যবস্থা। এ ধর্মে বিবাহ বিচ্ছেদ নেই । তবে ১৯৪৬ সালের হিন্দু আইন অনুযায়ী বিবাহিত মহিলার পৃথক বসবাস এবং ভরণপোষণ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উক্ত আইনের ১৮ ধারায় বলা হয়েছে এই আইন প্রচলিত হবার পূর্বে বা পরে বিবাহিতা একজন স্ত্রী, যদি সে অসতী না হয় বা অন্য ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে হিন্দু ধর্ম হতে বহিস্কার না হয়, তবে সে তার জীবন কালে স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ পাবার অধিকারী *(পাটোয়ারী: ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১২০)।*
ধর্মীয় ভাবেও হিন্দু বিবাহের মধ্যে এমন কিছু রীতি নীতি রয়েছে যার মাধ্যমে হিন্দু নারী তার বৈবাহিক জীবনে পৃথক বসবাসের কথা চিন্তাও করতে ভয় পায়;

৬. ভরণপোষণ ও অভিভাবকত্ব:

হিন্দু ধর্ম অনুসারে পিতা, পিতার অবর্তমানে পুত্র, পুত্র না থাকলে স্বগোত্রীয়রাই ভরনপোষণ এবং অভিভাবকত্ব করে থাকেন। এর সুনির্দিষ্ট কোন আইন লিখিত নেই। তবে যুগ যুগ ধরে চলে আসা সামাজিক বিবেচনা এবং প্রথাগত ভাবেই একজন হিন্দু ব্যক্তি তার স্ত্রী, নাবালক পুত্র, অবিবাহিতা কন্যা, বৃদ্ধ পিতা মাতার ভরণপোষণ দিতে বাধ্য থাকে।

৭. বিমাতার ভরণপোষণ:

হিন্দু আইনে বিমাতার ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে কারো উপর নির্দিষ্ট করা নেই। তবে, পিতা যেহেতু তাকে স্ত্রী হিসেবে ভরণপোষণ দিতে বাধ্য ছিলেন, সেজন্য পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করলে সেই সম্পত্তি হতে পুত্র বিমাতাকে ভরণপোষণ দিবেন। (আইন ও সালিশ কেন্দ্র, আইনের কথা-হিন্দু পারিবারিক আইন-জুন ২০০২, তৃতীয় সংস্করণ)

উত্তরাধিকার নীতির সংশোধন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ও ভারত

বৃটিশ শাসনামলে বিবাহ, উত্তরাধিকার, সম্পত্তি হস্তান্তর প্রভৃতি ক্ষেত্রে হিন্দু আইনের বিভিন্ন পরিবর্তন আনা হয়। লর্ড ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং এ্যাক্ট পাস করে প্রথম হিন্দু আইনকে আধুনিকীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত আইন প্রণীত হয়:

১. সতীদাহ প্রথা নিরোধ সংক্রান্ত রেগুলেশন, ১৮২৯

Dhaka University Institutional Repository

২. বর্ণগত অক্ষমতা আইন দূরীকরণ আইন, ১৮৫০

৩. হিন্দু বিধবা পুর্নর্বিবাহ আইন, ১৮৫৬

৪. দেশীয় ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৮৬৬

৫. বিশেষ বিবাহ আইন, ১৮৭২

৬. সম্পত্তি হস্তান্তর আইন, ১৮৮২

৭. সাবালকত্ব আইন, ১৮৭৫

৮. অভিভাবক ও পোষ্য আইন, ১৮৯০

৯. হিন্দু উত্তরাধিকার (অক্ষমতা দূরীকরণ) আইন, ১৯২৮

১০. হিন্দু উত্তরাধিকার (সংশোধন) আাইন, ১৯২৯

১১. শিশু বিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯

১২. সম্পত্তি হস্তান্তর (সংশোধন) সম্পূরক আইন, ১৯২৯

১৩. হিন্দু বিদ্যা দ্বারা উপার্জিত আইন, ১৯৩০

১৪. সম্পত্তিতে হিন্দু নারীর অধিকার আইন, ১৯৩৭

১৫. হিন্দু বিবাহিতা মহিলাদের পৃথক বসবাস ও ভরণ পোষণ আইন, ১৯৪৬

এরপর ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হওয়ার পর ভারতীয় আইনসভা হিন্দু আইনকে যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন পাশ করে। তবে ১৯৪৭ সালের পর ভারতে যে সমস্ত আইন প্রণীত হয়েছে তা বাংলাদেশে প্রযোজ্য নয়। ইংরেজ শাসনামলে হিন্দু আইনের ক্ষেত্রে যেসব পরবর্তন আনা হয়েছিল কেবল মাত্র সেগুলিই এদেশে বলবৎ রয়েছে। বাংলাদেশে এর কোন সংস্কার বা সংশোধন হয়নি (ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড, পৃষ্ঠা -৭৪, ১৯৯৩)। তবে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন ১৯৯৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে এক রায়ে বলেন, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ (১৯৮৫ এর ১৭)-এর সেকশন ৫ ও ২৩ ধারা শুধুমাত্র মুসলিমদের বেলায় নয় বাংলাদেশের অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে (DLR ১৯৮৫ (47 Vol. XLVII)। ১৯৮৫ সালের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ-এ বলা হয়েছে, Jurisdiction of Family Courts- subject to the provisions of the Muslims Family Ordinance, ১৯৬১ (VIII of 1961), a Family Court shall have exclusive jurisdiction to entertain, try and dispose of any suit relating to, or arising out of all or any of the following matters, namely—1) Dissolution of marriage; 2) Restriction of conjugal rights; 3) Dower; 4) Maintenance and 5) Guardianship and custody of children. (Obaidul Huq Choudhury's Hand Book of Muslim Family Laws "DLR 1997, Section 5, Page 3 Fifth Edition)

Dhaka University Institutional Repository

ভারতে ১৯৩৭ সালের হিন্দু মহিলার সম্পত্তির অধিকার আইন ১৯৩৮ সালে সংশোধিত হয়। বাংলাদেশের প্রায় সকল জায়গায়ই দায়ভাগ মতবাদে সম্পত্তি উত্তরাধিকার বন্টিত হয়ে থাকে বিধায়, এই দেশে ১৯৩৭ সালের এই আইন প্রযোজ্য হয়না। এই আইনে বলা হয়েছে যে, হিন্দু আইনের কোন বিধান বা প্রথা থাকা সত্ত্বেও যেখানে কোন হিন্দু উইল না করে মারা গেলে সেখানে ৩ ধারার শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে। যখন দায়ভাগ মতবাদের অধীনে কোন হিন্দু উইল না করে সম্পত্তি রেখে মারা যান এবং অন্য কোন আইন বা প্রথাগত আইনের অধীনে কোন হিন্দু পৃথক সম্পত্তি উইল না করেই মারা গেলে তখন ঐ মৃত ব্যক্তির এক বা একাধিক বিধবা স্ত্রী থাকে তারা একত্রে ৩ ধারার বিধান অনুসারে যে সম্পত্তি সে উইল করে যায় নাই; তাতে তার পুত্রের মতো অংশ পাবে। তবে শর্ত থাকে যে পূর্বে মৃত পুত্রের কোন বিধবা স্ত্রী যদি পূর্বে মৃত পুত্রের কোন জীবিত পুত্র না থাকে তাহলে পুত্রের মতো করে সম্পত্তি অর্জন করবে এবং উক্ত বিধবা স্ত্রী পুত্রের মতো করে সম্পত্তি পাবে যদি ঐ পূর্বে মৃত পুত্রের পুত্র বা পুত্রের পুত্র জীবিত থাকে। আরও শর্ত থাকে যে, পূর্বে মৃত পুত্রের বিধাব স্ত্রীর ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। দায়ভাগ মতবাদ বা প্রথাগত আইন দ্বারা পরিচালিত নয় এমন কোন হিন্দু যদি তার মৃত্যুর সময়ে যৌথ পরিবারের সম্পত্তিতে স্বার্থ রেখে মারা যায়; তাহলে তার বিধবা স্ত্রী বিধান সাপেক্ষে যৌথ সম্পত্তির সমান অংশ পাবে। এই ধারা মতে কোন স্বার্থ যদি হিন্দু বিধবার উপর অর্পিত হয়; তাতে সীমিত স্বার্থ থাকবে যা হিন্দু মহিলার সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং একজন পুরুষের মতো উক্ত সম্পত্তি বন্টন করে নেওয়ার অধিকার উক্ত বিধবার থাকবে (পাটোয়ারী : ১৯৯৮; পৃষ্ঠা . ৪৩-৪৪)।

স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারতীয় পার্লামেন্টে এ সংক্রান্ত যেসকল আইন প্রণীত হয়:

১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন অনুসারে ভারতে এক স্ত্রী বর্তমান থাকলে পুরুষর দ্বিতীয় বিবাহ নিষিদ্ধ;

১৯৫৬ সালের উত্তরাধিকার আইন অনুসারে ভারতে বিধবা স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনী রূপে স্বীকৃত;

১৯৫৬ সালের হিন্দু অভিভাকত্ব ও নাবালকত্ব আইনে প্রাচীন শাস্ত্রীয় অনুশাসনে পুত্রের উপর পিতার অধিকার বা পুত্র ভর্তারই হয়। এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পিতাকেই নাবালক পুত্র ও কন্যার একমাত্র অভিভাবক রূপে স্বীকৃত দেওয়া হয়েছে;

১৯৬১ সালে পন প্রথার নিষিদ্ধ করণ আইনের ব্যর্থতার পর ১৯৮৪ সালের পন প্রথা নিষিদ্ধকরণ সংশোধনী আইন প্রণীত হয়।

উল্লেখ্য, ভারতীয় পার্লামেন্ট প্রনীত এ সকল আইন বাংলাদেশের হিন্দুদের জন্য প্রযোজ্য নয়। অখন্ড ভারতবর্ষে যে সকল আইন প্রবর্তীত হয়েছিল স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে কেবল সেই আইনগুলোই বলবৎ রয়েছে। তথাপি দেখা গেছে যে কোন কোন আইন প্রচলিত হলেও বাংলাদেশর প্রেক্ষাপটে তা প্রযোজ্য নয়। যেমন বলা যায় বিধাব বিবাহ আইন, বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন।

সার সংক্ষেপ:

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায়, হিন্দু ধর্মগ্রন্থে নারীকে কখনো মর্যাদার উচ্চ আসনে বসানো হয়েছে, আবার কখনো পুরুষের অলঙ্কার হিসেবে তুলে ধরে তার স্বতন্ত্র ব্যক্তি সত্ত্বাকে অস্বীকার করা হয়েছে। একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় নারী চরিত্রকে

Dhaka University Institutional Repository

কখনোই অন্তঃপুরের বাইরে আনা হয়নি। হিন্দু ধর্মে নারীর অবস্থান সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর মতামত উল্লেখ করা যেতে পারে। সব স্মৃতি, শ্রুতি, পুরান শাস্ত্র, বিবেচনায় এনে তিনি তাঁর "হিন্দু ধর্ম ও সমাজ" গ্রন্থে বলেছেন -"ইহা ভাবিতে দুঃখ হয় যে সকল পুরুষ নারীর স্বাধীনতা নিজের স্বাধীনতায় ন্যায় জ্ঞান করেন এবং যাহারা নারীকে জাতির মাতৃ স্বরূপ জ্ঞান করেন তাহাদের শ্রদ্ধাকর্ষণের অনেক স্মৃতি শাস্ত্রে রহিয়াছে। স্মৃতি শাস্ত্রের অনেক বাক্য আছে যাহা নারীকে অনেক মর্যাদার আসনে আসীন করিয়াছে। ধর্মশাস্ত্রের নামে যাহা কিছু ছাপা হয় তাহাই ভগবৎবানী বলিয়া গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা নাই। (মহাত্মা গান্ধীঃ ২০০৩, *পৃষ্ঠা*-১৯)"

হিন্দু পারিবারিক আইনের উৎস সন্ধানে দেখা গেছে, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের বিধি-বিধানই এর প্রধান ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে। হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারীদের অবস্থা বেশ নাজুক। পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর প্রাপ্য অধিকার নাই। যা অছে তা জীবনস্বত্ব। জীবিত অবস্থায় ভোগ দখল করতে পারবে, কিন্তু বিক্রি বা হস্তান্তর করতে পারবে না। বিবাহ রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক না হওয়ায় নারীর মানবাধিকার নানাভাবে লঙ্ঘিত হয়। শাস্ত্র মতে বিবাহ অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিবাহ রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করার আইন এবং বিধান প্রয়োজন। কালের পরিক্রমায় বাংলাদেশের হিন্দু পারিবারিক আইন অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। হিন্দু অধ্যুষিত ভারতে এই আইন পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পরিবর্তন হলেও বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত এই আইনের কোন পরিবর্তন হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৩

নারীর ক্ষমতায়ন : তাত্ত্বিক আলোচনা
বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন পর্যালোচনা ও
হিন্দু নারীর ক্ষমতায়ন

ক. নারীর ক্ষমতায়নঃ তাত্ত্বিক আলোচনা

That is the men and women are created equal, that they are endowed by their creator in certain inalienable rights that among those are life, liberty and the pursuit of happinss.
-Voice from Women Liberation, edited by Tanner (News Network 1997). লেখক তার বক্তব্যে নারী-পুরুষ বৈষম্য বিলোপের আকুল প্রার্থনা করছেন। কিন্তু বাস্তবতা এই অবস্থার ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

পাকিস্তান ভিত্তিক হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (এইচ ডি সি) এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন, "দক্ষিণ এশিয়ার নারী হওয়া মানে ব্যক্তি অস্তিত্ব বিহীন হওয়া।" শ্রীলঙ্কার মতো কোন দেশ এই দৃষ্টিভঙ্গিকে খুব বেশী নেতিবাচক মনে করলেও বাংলাদেশ এই মতের বিরোধিতা করতে পারবে না। বাংলাদেশে নারী হওয়া মানে ব্যক্তি অস্তিত্ব বিহীন হওয়া, কমপক্ষে নিম্নস্তরের ব্যক্তি হওয়া।

বাংলাদেশের উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বি আই ডি এস) কর্তৃক ৭৭৬০ জনের মধ্যে পরিচালিত এক নমুনা জরিপে দেখা গেছে, এই দেশে পুরুষের মানব উন্নয়ন সূচকের (এইচ ডি আই) তুলনায় নারীর মানব উন্নয়ন সূচকের শতকরা হার মাত্র ৭৭। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সূচকের ভিত্তিতে এই মানব উন্নয়ন সূচক পরিমাপ করা হয়। নারীর মানবাধিকার বা ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি রাষ্ট্র-রাজনীতি ও আর্থসামাজিক কাঠামো বহির্ভূত কোন বিষয় নয়। দীর্ঘ সংগ্রাম ও আন্দোলনের প্রেক্ষিতে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি জাতিসংঘ সনদে সর্বসম্মতভাবে অন্তর্ভুক্ত ও স্বাক্ষরিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ সর্বসম্মতভাবে সহস্রাব্দ ঘোষণায় স্বাক্ষর করে। ২০১৫ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় এবং তা অর্জনের অঙ্গীকার করা হয়। লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন এগুলোর মধ্যে একটি। নারীর প্রতি সব ধরণের বৈষম্য দূরীকরণ সনদ (সিডও) সনদে নারীর ক্ষমতায়নের কথা গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে। সিডও মুখবন্ধে বলা হয়েছে, একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন, বিশ্বকল্যাণ ও শান্তির জন্য জীবনের সর্বস্তরে পুরুষের সঙ্গে নারীর সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সব মহলে এই উপলব্ধি বাড়ছে যে সমাজের অর্ধেক মানব সম্পদকে বাদ দিয়ে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। ক্রমবর্ধমান এই সচেতনতার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করেছে যাতে উন্নয়নের সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশীদারিত্বের কথা বলা হয়েছে।

পিতৃতন্ত্র:

সমাজে পুরুষের আধিপত্য বিস্তারের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে তাত্ত্বিকেরা যে বিশেষ সমাজ বিন্যাস করেছেন তাকেই পুরুষতন্ত্র আখ্যা দেওয়া হয়েছে। পিতৃতন্ত্র শব্দটির অক্ষরিক অর্থ হলো পিতা বা পিতৃ সমতুল্য কোন ব্যক্তির কর্তৃত্ব, ক্ষমতা বা নিয়ন্ত্রণ। অবশ্য এখানে "পিতা" ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত, কেবলমাত্র জনকরূপেই নয়। প্রথমে পিতৃতন্ত্র বলতে বিশেষ এক পুরুষের আধিপত্যের অধীন পরিবার, পরিবারে অবস্থিত নারী, অন্যান্য কম বয়সী পুরুষ, শিশু, চাকর-বাকর, দাস-দাসী ইত্যাদি আর সবার উপরে পরিবারের কর্তা পুরুষ ব্যক্তি। সাধারণভাবে সর্বক্ষেত্রে পুরুষের আধিপত্য এবং নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন রাখার সম্পর্ককে প্রকাশ করা হয় পিতৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্র শব্দটি দ্বারা।

প্রখ্যাত নারীবাদী মনস্তাত্বিক জুলিয়েট মিচিলের মতে, পিতৃতন্ত্র এমন একটি সাম্পর্কীক ব্যবস্থা, নারী যেখানে পুরুষের হাতে বিনিময়ের দ্রব্য মাত্র। মিচেল মনে করেন, এই ব্যবস্থায় পিতার এক ধরনের প্রতীকি ক্ষমতা থাকে, যে প্রতীকি ক্ষমতাই নারীর হীণমন্যতার জন্য দায়ী। অপর নারীবাদী তাত্বিক সিলভিয়া ওয়ালবি তার Theorising Patriarchy বইয়ে পিতৃতন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলেন, পিতৃতন্ত্র সামাজিক কাঠামো আর রীতিনীতির এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে পুরুষ নারীকে নিয়ন্ত্রণ ও শোষণ করে। মূলতঃ পিতৃতন্ত্র এমন একটি মতাদর্শ যা পুরুষকে নারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী করে বলে মনে করে, নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্যকে অনুমোদন করে এবং নারীকে পুরুষের সম্পত্তি বলে গণ্য করে (গুপ্তঃ ১৯৯৮, পৃ-৬১, ভাসিন, কমলাঃ পৃ-১ সন অনুক্ত)

পিতৃতন্ত্রের উৎপত্তিঃ

পিতৃতন্দ্রের উৎপত্তির ইতিহাস জানতে গিয়ে আমরা দেখি যে ফ্রেডরিক এঙ্গেলস ১৮৮৪ সালে তার Origins of the Family, Private Property, and State এবং নারীবাদি তাত্ত্বিক গের্ডা লার্নার তার He creation of patriarchy (Oxford and Nweyork: Oxford University Press, 1989) বইয়ে পিতৃতন্ত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা থেকে আমরা বলতে পারি যে, মানব সভ্যতার শুরুতে পিতৃতন্ত্র বা পুরুষের প্রভাব নারীর উপর ছিলনা।

Dhaka University Institutional Repository

নারীরাও অধঃস্তন অবস্থার শিকার হয়নি। নারী পুরুষের প্রাকৃতিক ভিন্নতা কোন বৈষম্য হয়ে দাঁড়ায়নি সেকালে। কিন্তু সমাজ বিকাশের সাথে সাথে সমাজের সম্পত্তির মালিকানা এবং শ্রম বিভাজনের সাথে সাথেই নারী বশ্যতার শুরু হয়। এঙ্গেলস মনে করেন, আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি হল, সম্পত্তির উত্তরাধিকার হস্তান্তরের জন্য সন্তান উৎপাদনের লক্ষ্যে নারীকে গৃহ বন্দি করে রাখা। তার মতে বিবাহের মাধ্যমে নারী পুরুষের যৌনতার দ্বিধাবিভক্ত দ্বিমুখীনতার শুরু এই সময় হতেই। রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এক বিবাহ ভিত্তিক পরিবার ক্রমে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে রুপান্তিরিত হয়। এঙ্গেলস ও মার্কসবাদীরা নারীর বশ্যতাকে কেবল অর্থনৈতিক দিক হতেই ব্যাখ্যা করেছেন। মার্কসবাদীরা মনে করতেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলুপ্ত হলে এবং নারী শ্রমশক্তির অংশ হয়ে উঠলেই পিতৃতন্ত্রের বিলুপ্ত হবে। তবে এঙ্গেলস ও মার্কসের মতের সাথে লর্ড র্লানার দ্বিমত পোষণ করলেও তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির উৎপত্তি, এক বিবাহ প্রথা ও যৌনবৃত্তির মধ্যকার সম্পর্ক স্পষ্ট করেছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, পারিবারিক সম্পর্কের কাঠামোগত পরিবর্তনের সঙ্গে শ্রম বিভাজন ও সমাজে নারীর অবস্থানের সংযোগ রয়েছে।

ব্যবহারিক জীবনে পিতৃতন্ত্রের প্রকাশঃ

ব্যবহারিক জীবনে আমরা নানাভাবে পিতৃতন্ত্রের প্রকাশ দেখতে পাই। পুত্র সন্তানের অকাঙ্খা, খাদ্য বন্টনে মেয়েদের প্রতি বৈষম্য, মেয়েদের উপর কেবল পারিবারিক দায়-দায়িত্ব চাপানো, মেয়েদের শিক্ষার সুযোগে অনীহা, নারী নির্যাতন, মেয়েদের পছন্দ-অপছন্দ নিয়ন্ত্রণ করা, কর্মক্ষেত্রে অসম্মান এবং শ্লীলতাহানি, নারীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করা, নারীর প্রজনন যৌন অধিকারহীনতা, গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানে নারীর ইচ্ছা অনিচ্ছাকে উপেক্ষা করা ইত্যাদি হলো ব্যবহারিক জীবনে পিতৃতন্ত্রের রূপ।

পিতৃতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যঃ

এঙ্গেলস ও লর্ড র্লানার এর পিতৃতন্ত্রের ব্যাখ্যার মধ্যেই পিতৃতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। পুরুষ প্রাধান্যের সামাজিক ব্যবস্থাই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য, যেখানে নারীরা নিয়ন্ত্রিত এবং বৈষম্যের শিকার। পিতৃতন্ত্র বলতে তাই -

- পুরুষ প্রাধান্যশীল সমাজ;
- পুরুষেরাই সম্পত্তি রক্ষা করে;
- পুরুষরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে;
- পুরুষের প্রতি গুরুত্ব দেয়া;
- পুরুষদের স্বাধীনতা বেশী;
- পুরুষের ক্ষমতা বেশী;
- পুরুষের শারীরিক ক্ষমতা বেশী;
- পুরুষেরা প্রজনন প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

খ. পিতৃতন্ত্র ও বাংলাদেশের সমাজ

বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোতে পুরুষতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান । বাংলাদেশের সামাজিক ব্যবস্থায় দু'একটি অদিবাসী সম্প্রদায় ব্যতীত সর্বত্র পিতৃতন্ত্র বিরাজমান। যে সকল পরিবার মাতার বা নারীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়, সে সকল পরিবারের পুরুষদের ব্যক্তিত্বহীন মনে করা হয়। মুসলিম সম্প্রদায়ে নারীকে রাখা হয়েছে পর্দানশীল করে। তারা পারিবারিক গন্ডির বাইরে পুরুষের অনুমতি ছাড়া যেতে পারে না। আর যেতে হলেও সুযোগ কোন পুরুষ ব্যক্তি বা বয়োজেষ্ঠ্য ব্যক্তিকে সঙ্গে নিযে যেতে হবে। এর উপর আবার নারীকে পর্দা দ্বারা আবৃত করে রাখার নিয়ম। নারী কেবল অন্তরুরবাসীনি। মূলত: পিতৃতন্দ্রের আদর্শ এমন ভাবে ধর্মীয় রীতি দ্বারা আবৃত যা পুরুষকে নারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ এবং শক্তিশালী বলে মনে করে, নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্যকে অনুমোদন করে এবং নারীকে পুরুষের সম্পত্তি বলে গন্য করে। হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে নারীর জন্ম হচ্ছে পুরুষের দক্ষিণ উরু হতে। এই জন্য নারী পুরষের অধীন চিরকাল। নারীর পূর্ণতা পুরুষের করতলগত হওয়ার মধ্যে ধর্মীয়ভাবে এমন বিধান রাখা হয়েছে যে, নারী পুরুষের অধীন হতে বাধ্য। সমাজের প্রতিটি স্তরেই নারী পুরুষের অধীনস্ত। আর এভাবেই যুগ যুগ ধরে সমাজের সকল পর্যায়ে পুরুষ আধিপত্য বিস্তার করেছে। পুরুষেরা মনে করেন, "পুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্যা ।" অর্থাৎ পুত্রের জন্যই স্ত্রী।

ক্ষমতায়ন:

১৯৮০ এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ক্ষমতায়ন শব্দটি সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোতে কল্যাণ, উন্নয়ন, অংশগ্রহণ, দারিদ্র্য বিমোচনের মতো শব্দগুলির পরিবর্তন হয়। ক্ষমতায়ন হল উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, একটি প্রক্রিয়া, যার দ্বারা মানুষ নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করে বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়। অন্য কথায় ক্ষমতায়ন হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ এবং প্রভাবিত করার অধিকার, ক্ষমতা ও সুযোগ অর্জন। Websters II New Rivisside University Dictionary Ges Funk and Wagnalls Canadian College Dictionary -তে ক্ষমতায়নের শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে "invest with legal power," "to authorize" and "to enable". এর অর্থ আইনসঙ্গতভাবে ক্ষমতা চর্চা, কর্তৃত্ব প্রদান ও ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধ ব্যবস্থা প্রদান (আবেদা সুলতানা, ১৯৯৮; পৃ:৩)।

সাধারণ কথায় ক্ষমতায়ন হচ্ছে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম (সুলতানা আবেদা, ১৯৯৮: পৃ:৩)। তাই ক্ষমতায়নের সংজ্ঞা দেওয়া যায় এভাবে, "To give someone more control over their own life or situation." নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি পরিষ্কারভাবে এভাবে বোঝানো যায়, একজন ক্ষমতা সম্পন্ন নারী হবে এমন একজন যিনি আত্মনির্ভরশীল এবং যিনি জীবন এবং পরিবেশকে সুক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘের দৃষ্টিতে, ক্ষমতায়ন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা একটি জনগোষ্ঠী প্রতিবন্ধক অপসারণের জন্য নিয়ন্ত্রণ ও কর্মকাণ্ড গ্রহণ করে। যে কাঠামোগত অসাম্য একটি শোষিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে একটি সমস্যামূলক অবস্থানে ঠেলে দিয়েছিল, সেই কাঠামোগত অসাম্যতার প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য উক্ত জনগোষ্ঠীর সমবেত কর্মকাণ্ডকে ক্ষমতায়ন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সংজ্ঞা অনুসারে "ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা নারী কল্যাণে সমতা এবং সম্পদ আহরণে সমান সুযোগ অর্জনের লক্ষ্য সামনে নিয়ে জেন্ডার বৈষম্য অনুধাবন, চিহ্নিতকরণ ও বিলোপ সাধনের জন্য একজোট হয় (সুলতানা আবেদা, ১৯৯৮: পৃ:৩)।" (It is the process by which women mobilize to understand identify and overcome gender discrimination so as to achieve equality of welfare and equal access of resources.)

এছাড়াও যে সকল বিষয় ব্যক্তি তার জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে এবং সেগুলোর ব্যাপারে নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই দিতে পারেন। বস্তুত: ব্যক্তি জীবনকে প্রভাবিত করে এমন, তিন ধরনের সম্পদের উপর অর্থাৎ, বস্তুগত (জমি, জলাশয়, ও বনভূমি ইত্যাদি), বুদ্ধিবৃত্তিক (জ্ঞান, তথ্য, ধারণা ইত্যাদি) ও মানবিক (একটি আদর্শিক আর্থ-সামাজিক পরিবেশে মানুষ যেভাবে উপলব্ধি করে এবং সক্রিয় হয়) সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারই হল ক্ষমতায়ন। ক্ষমতায়ন তাই একই সঙ্গে একটি প্রক্রিয়া এবং সেই প্রক্রিয়ার ফল।

ক্ষমতায়ন এভাবেই সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অধিকার দেয়, কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈধ ক্ষমতা ব্যক্তিকে ক্ষমতায়িত করে তোলে। যার ফলে ক্ষমতায়িত ব্যক্তি নিজের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈধতার অধিকার থেকে সম্পদের উপর মালিকানা লাভ করে। ক্ষমতায়ন এভাবেই ক্ষমতা এবং উন্নয়নের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কিত কিছু মৌলিক ধারণা সম্পর্কে নতুন দিক নির্দেশনা দান করে।

একজন মানুষ যখন জীবন নির্বাহের পাশাপাশি কারো উপর নির্ভরশীল না হয়ে তার সম্পর্কীত সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এ অবস্থানটিই হচ্ছে ক্ষমতায়ন। ক্ষমতায়নের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক বিদ্যমান

- অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বলতে, যখন একজন মানুষ অর্থনৈতিকভাবে কারো উপর নির্ভর না করে নিজের সংস্থান করতে পারেন, অন্যের কাছে যার নির্ভরশীল হতে হয় না ।
- সামাজিক ক্ষমতায়ন বলতে, যখন একজন মানুষের জন্য সামাজিক সকল প্রতিষ্ঠানে অভিগম্যতা (access) সৃষ্টি হয় এবং এসব প্রতিষ্ঠান থেকে যখন সে সুফল ভোগ করতে পারে।
- রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বলতে একজন ব্যক্তি যখন রাজনৈতিকভাবে মতামত দিতে পারে, ভোট দিতে পারে, নির্বাচনে অংশ নিতে পারে এ অবস্থাকেই বোঝায়।

Dhaka University Institutional Repository

- সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়ন বলতে একজন ব্যক্তির ধর্মীয়, সামাজিক জীবন পদ্ধতির সুষ্ঠু বিকাশ এবং পরিচালনাকেই বোঝায়।

ক্ষমতায়ন হচ্ছে নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল, যে আইন, যে শিক্ষা ব্যক্তি তার নিজের আয়ত্ত্বের মধ্যে রেখে জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করতে পারে এবং নিজেকে এগিয়ে নিতে পারে।

ক্ষমতায়নের সূচক/নির্দেশক (Indicators)

ক্ষমতায়নের সংজ্ঞার আলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর জন্য ক্ষমতায়নের কতকগুলো সূচক বা নির্দেশনা রয়েছে। যেমন-

১) সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ;

২) সম্পদের উপর অধিকার;

৩) শিক্ষার সুযোগ;

৪) সন্তান বা পরিবার পরিচালনা;

৫) উপার্জনের উপর সিদ্ধান্ত;

৬) বিয়ে বা অন্যান্য বিষয়ে নিজের সিদ্ধান্ত;

৭) পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়াবলীতে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা।

ক্ষমতায়নের ব্যাখ্যার পরে এবার আসা যাক সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নারীর ক্ষমতায়ন কি নেই ব্যাখ্যায় এবং এরই প্রেক্ষিতে
বাংলাদেশে হিন্দু নারীর অবস্থান।

নারীর ক্ষমতায়ন:

নারীর ক্ষমতায়ন এমনই একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারী তার নিজ অবস্থান বা আপেক্ষিক সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হবে, বিরাজমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানগত বৈষম্যে প্রতিবাদে সোচ্চার হবে। সর্বোপরি আপন শক্তি অর্জনের জন্য সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সকল বৈষম্য দূরীকরণে তথা নারী পুরুষের সমতার লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হবে। (সুলতানা আবেদা, ১৯৯৮: পৃ- ৫)

Dhaka University Institutional Repository

নারীর ক্ষমতায়ন বলতে নারীর নিজস্ব শক্তি বৃদ্ধি, তার জীবন, তার অবস্থান, তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শক্তি বৃদ্ধি বোঝানো হচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারী বস্তুগত ও মানবিক সম্পদের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে। (সুলতানা নাসরিন, ২০০১ঃ পৃষ্ঠা- ৪২)

নারীর ক্ষমতায়নের অর্থ হচ্ছে অসাম্যমূলক কাঠামোতে পরিবর্তন। এর মধ্যে থাকবে আইন, পারিবারিক আইন, সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকার সংক্রান্ত অধিকার। নারীর নিজের শরীর, শ্রম, সামাজিক এবং আইনী প্রতিষ্ঠান এর উপর নারীর নিয়ন্ত্রণ, তার ক্ষমতায়নের জন্য একদিকে সম্পদ (অর্থ, জ্ঞান, প্রযুক্তি) দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং নেতৃত্ব এবং অন্যদিকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, সংলাপ, সিদ্ধান্ত ও নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ।

নারীর ক্ষমতায়নের পূর্বশর্ত:

নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ৪টি মৌলিক শর্ত রয়েছে যার মাধ্যমেই কেবল নারী ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। শর্তগুলো হচ্ছে, শিক্ষা, অংশগ্রহণ, অর্থনৈতিক মুক্তি ও আইনী ব্যবস্থা।

নারীর ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্য:

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতার উৎস ও কাঠামোর পরিবর্তন। এছাড়াও নারীর ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে

- পিতৃতান্ত্রিক আদর্শকে প্রশ্নের সম্মুখীন করা;
- যে সকল কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান নারীর অধঃস্তনতা ও অসমতাকে চিরস্থায়ী করে সেগুলির পরিবর্তন;
- বস্তুগত ও তথ্যগত সম্পদের সুযোগলাভ এবং এসবের নিয়ন্ত্রণে নারীকে সক্ষম করে তোলা।

নারীর ক্ষমতায়নের সামাজিক দিক:

নারীর ক্ষমতায়ন শুধু নারীর বিষয় নয়, এটি একটি সামাজিক বিষয়। আমাদের সমাজে দুই ধরনের ক্ষমতায়ন জনপ্রিয় ১) দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন এবং ২) নারীর ক্ষমতায়ন।

যে প্রক্রিয়া সকল ক্ষেত্রে অসমতা ও বৈষম্য দূর করে নারীকে পুরুষের সমকক্ষতায় সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তাই নারীর ক্ষমতায়ন। ক্ষমতায়ন একই সঙ্গে একটি প্রক্রিয়া ও সেই প্রক্রিয়ার ফসল। (সুলতানা, নাসরিন, ২০০১ঃ পৃষ্ঠা- ৩৮)

একজন নারী কতটুকু ক্ষমতার অধিকারী তা নির্ণীত হয় পরিবার ও সমাজে পুরুষের সঙ্গে দৈনন্দিন কাজ ও ভূমিকার ক্ষেত্রে, দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে, অবকাশ ও বিনোদনের ক্ষেত্রে, সম্পদের ক্ষেত্রে, পছন্দের ক্ষেত্রে এবং সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তার অবস্থান কি তার দ্বারা।

Dhaka University Institutional Repository

গ. পুরুষতন্ত্রের আলোকে বাংলাদেশের হিন্দু নারীর ক্ষমতায়ন বিশ্লেষণ

পিতৃতন্ত্রের পূর্বে বৈদিক যুগে ছিল মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। আর এই মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের উত্তরাধিকারী নির্ণীত হতো মাতার পরিচয়েই। হিন্দু ধর্ম যেহেতু বৈদিক যুগের ধর্ম বিশ্বাসে বিশ্বাসী সেহেতু আমরা দেখতে পাই যে, এই সময়ে নারীর অধিকার ও সম্মান ছিল উচ্চে। নারী ছিল সকল ক্ষমতার পরিচায়ক। তার প্রমাণ পাওয়া যায় পৃথার পুত্র পার্থ, সৌমিত্রীর পুত্র সৌমিত্র ইত্যাদি পরিচয়ের মাধ্যমে। হিন্দু ধর্মের যুগ চেতনা এক নয়। বেদ ও বেদের পরবর্তী যুগের নারী চিত্রে ভিন্নতা রয়েছে। বেদ পবরবর্তী সময়ে শ্রম বিভাজন এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ণয়ের সূত্র ধরেই পিতৃতন্ত্রের শুরু। সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পত্তির রূপান্তর ঘটলেও পিতৃতন্ত্রের কোন রূপান্তর ঘটেনি। হিন্দু ধর্মে এরও প্রমাণ মেলে দশরথের পুত্র দাসরথী পরিচয়ের মাধ্যমে। এই সময়েই নারীর অবস্থানের পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। সময়ের পরিবর্তনে নারীর অধিকারের স্বরূপ এবং স্বাধীনতার সংজ্ঞার পরিবর্তন হয়েছে। ফলে সমানাধিকারের এই যুগে নারী তার অধিকার হতে বঞ্চিত আর এরই কারণে নারীর মানবাধিকার আন্দোলন আজও অব্যাহত। নারীর এহেন অবস্থানের মধ্যে বাংলাদেশে হিন্দু নারী অনেকটাই নিম্নস্তরে রয়েছে। কারণ সাধারনভাবে ক্ষমতায়ন বলতে যে সকল বিষয় ব্যক্তির জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে এবং সেগুলোর ব্যাপারে ব্যক্তি যখন নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন; সেখানে ব্যক্তি জীবনকে প্রভাবিত করে এমন, তিন ধরনের সম্পদের উপর অর্থাৎ, বস্তুগত (জমি, জলাশয় ও বনভূমি ইত্যাদি), বুদ্ধিবৃত্তিক (জ্ঞান, তথ্য, ধারণা ইত্যাদি) ও মানবিক (একটি আদর্শিক আর্থ-সামাজিক পরিবেশে মানুষ যেভাবে উপলব্ধি করে এবং সক্রিয় হয়) সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারকে স্বীকার করা হয়। ক্ষমতায়ন তাই একই সঙ্গে একটি প্রক্রিয়া এবং সেই প্রক্রিয়ার ফল। ক্ষমতায়ন এভাবেই সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অধিকার দেয়, কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈধ ক্ষমতা ব্যক্তিকে ক্ষমতায়িত করে তোলে। যার ফলে ক্ষমতায়িত ব্যক্তি নিজের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈধতার অধিকার থেকে সম্পদের উপর মালিকানা লাভ করে। ক্ষমতায়ন এভাবেই ক্ষমতা এবং উন্নয়নের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কিত কিছু মৌলিক ধারণা সম্পর্কে নতুন দিক নির্দেশনা দান করে। বর্তমান বিশ্বের সাথে উন্নয়নের জোয়ারে নারীর ক্ষমতায়ন ব্যতীত উন্নয়ন সম্ভব নহে। সেখানে বাংলাদেশের হিন্দু সমাজের নারীর জীবন এখনো অনেকখানিই শত বছরের পুরানো ধর্মীয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নারীর ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্য যেখানে পিতৃতান্ত্রিক আদর্শকে প্রশ্নের সম্মুখীন করা; যে সকল কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান নারীর অধঃস্তনতা ও অসমতাকে চিরস্থায়ী করে সেগুলির পরিবর্তন; বস্তুগত ও তথ্যগত সম্পদের সুযোগ লাভ এবং এসবের নিয়ন্ত্রণে নারীকে সক্ষম করে তোলা। কেননা এখনো বাংলাদেশের হিন্দু সমাজে পুরুষেরা অধিকতর ক্ষমতা ভোগ করে, পুরুষেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, পুরষেরাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, নারীরা কোন সম্পত্তির নিরঙ্কুশ অধিকার পায়না। নারী ক্ষমতায়নের পূর্ব শর্ত যেখানে অর্থনৈতিক মুক্তি, অংশগ্রহণ এবং আইনী ব্যবস্থা সেখানে বাংলাদেশের হিন্দু নারীদের জীবন পরিচালিত হচ্ছে বেদ ও পৌরানিক যুগের আইন দ্বারা; যদিও সময়ের পরিবর্তনে এই আইনের অনেক পরিবর্তন হয়েছে যা হিন্দু নারীর ক্ষমতায়নের জন্য যথেষ্ট নয়। এর প্রমাণ পাওয়া যায় এই গবেষণার কেইস স্টাডি গ্রহণের মাধ্যমে। কেননা মাঠ গবেষণায় দেখা গেছে, সে সকল নারীরা স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী এবং এই সম্পত্তির নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারেন তারা যারা সম্পত্তি পাননি তাদের তুলনায় বেশী ক্ষমতার

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারী; এর প্রমাণ পাওয়া যায় তারা যখন তাদের পরিবারের সিদ্ধান্তে, সন্তানের সিদ্ধান্তে মতামত দিতে পারেন। আর যাদের তেমন কোন অর্থনৈতিক উৎস নেই আর কোন সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই তারা পরিবারে তেমন কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মতামত দিতে দ্বিধাগ্রস্থ হন এবং তাদের মতামতের কোন মূল্যও দেওয়া হয়না।

সার সংক্ষেপ:

নারীর ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত তাত্ত্বিক আলোচনা ও বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন পর্যালোচনার মাধ্যমে হিন্দু নারীর ক্ষমতায়নের পক্ষে যেসকল ইস্যু এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয় তাতে দেখা যায় পিতৃতন্ত্রের বিস্তৃত শেকড়ে আটকে আছে হিন্দু নারীর ভাগ্য। আর এই শেকড় বিস্তারে রসদ জুগিয়েছে ধর্মীয় বিধি-বিধান , প্রথা ও রীতি। পিতৃতান্ত্রিক এই ধর্মের নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়নের পথ রুদ্ধ। এখানকার সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই এমন যেখানে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ, সম্পদের উপর অধিকার, শিক্ষার সুযোগ, সন্তান বা পরিবার পরিচালনা; উপার্জনের উপর সিদ্ধান্ত; বিয়ে বা অন্যান্য বিষয়ে নিজের সিদ্ধান্ত এবং পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়াবলীতে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা খুবই হতাশাব্যঞ্জক।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৪

নারীর ক্ষমতায়নে আন্তর্জাতিক সনদ, জাতীয় নীতি এবং বাংলাদেশের হিন্দু নারী

সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশে যুগ যুগ ধরে নারী যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে, সে ভূমিকার যথাযথ স্বীকৃতিদান, সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা স্থাপন এবং মানুষ হিসেবে সার্বিক উন্নয়ন এবং বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় তথা নারী উন্নয়নে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসব আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*)। ১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এই সনদকে সংক্ষেপে সিডও (*CEDAW*) বলা হয়ে থাকে। এই সনদকে নারীর মানবাধিকার চুক্তি হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্র এই সনদ অনুমোদন করে স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশও এই দলিলে স্বাক্ষর করেছে। সিডও সনদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশে নারীর মানবাধিকার সংরক্ষণে বিভিন্ন বিধিমালা তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানেও এর আলোকে আইন রয়েছে। এই অধ্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নে গৃহীত আন্তর্জাতিক সনদ, জাতীয় নীতি ও কর্ম পরিকল্পনার আলোকে বাংলাদেশের হিন্দু নারীর অবস্থান চিত্রনের চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ক. সিডও সনদ ও বাংলাদেশের হিন্দু নারী

মানবাধিকারের মতো নারী অধিকারও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি বিশেষ আলোচিত বিষয়। নারী অধিকার মানবাধিকার। একজন মানুষ হিসেবে পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, নারীর ন্যায্য দাবীসহ একজন পুরুষের সাথে সমতালে অধিকার ভোগ করার নিশ্চয়তা নারীর অধিকার। একটি দেশের উন্নয়নে নারীর পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকলে ওই দেশের সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হবে। সেদিকে লক্ষ্য করেই বিশ্ব রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নারীর অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হয়েছে। সমান অধিকার সংরক্ষণের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদের সৃষ্টি হয়েছে।

এই সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই লক্ষ্যে রাষ্ট্রসমূহে প্রচলিত যেসব আইন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা বা ব্যবস্থা পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে সেগুলো পরিবর্তন বা বাতিল করবে এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করবে। এছাড়া সিডও সনদ যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদনকারী রাষ্ট্রসমুহ (১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ১৬৫ টি রাষ্ট্র) সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে যত্নবান ও আন্তরিক থাকবে। এই সনদ ৬টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত ৩০টি ধারা। (পরিচেছদ ১-৪) ধারা ১ থেকে ধারা ১৬ নারী পুরুষের সমতা সংক্রান্ত বা সনদের মূল বিষয়। (পরিচ্ছেদ ৫) ধারা ১৭ হতে ধারা ২২ সিডওর মূল বিষয় বাস্ত বায়ন সংক্রান্ত এবং (পরিচ্ছদ ৬) ধারা ২৩ থেকে ৩০ সিডওর প্রকাশণা সংক্রান্ত।

নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদের প্রথমেই বলা হয়েছে যে, যে কোন কর্ম বা আচরণ বা বিধান দ্বারা নারী পুরুষের বিভেদ সৃষ্টি করে যা এর ফলশ্রুতিতে নারীকে পুরুষের তুলনায় অধঃস্থন বা ছোট করে দেখা হয় এবং নারীর মানবাধিকার ও স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন, ব্যহত বা খর্ব করা হয়। বাংলাদেশ এই সনদের এই সংগার সাথে একমত হলেও এই ধারার ধারা ২, ধারা ১৩ (ক) এবং ধারার ১৬-১(গ) ও (চ) এ যে সমস্ত নীতি গুলো রয়েছে সেগুলো অনুমোদন করেনি।

এই সনদের ২ নং ধারায় যা বলা হয়েছে তা হলোঃ

ক) পুরুষ ও নারীর সমতার নীতি তাদের জাতীয় সংবিধান অথবা অন্য কোন উপযুক্ত আইনে ইতোমধ্যেই অর্ন্তভুক্ত নাহয়ে থাকলে তা অর্ন্তভুক্ত করা এক্তাং আইনের মাধ্যমে ও অন্যান্য উপযুক্ত উপায়ে এই নীতির প্রকৃত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

খ) নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ করে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে আইন মানতে বাধ্য করার ব্যবস্থা সহ উপযুক্ত আইনগত ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

গ) পুরুষের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে নারীর অধিকার সমূহের সুরক্ষা আইনগতভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং উপযুক্ত জাতীয় আদালত ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের যে কোন বৈষম্য থেকে নীকে রক্ষা কার্যকরভাবে নিশ্চিত করা।

ঘ) নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক যে কোন কর্মকান্ডে নিয়োজিত হওয়া থেকে বিরত থাকা এবং সরকার কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠান সমূহ যাতে এই দায়িত্ব অনুসারে কাজ করে তা নিশ্চিত করা।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ) কোন ব্যক্তি, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান যাতে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে না পারে তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

চ) প্রচলিত যে সব আইন, বিধি, প্রথা ও অভ্যাস নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে, সেগুলি পরিবর্তন অথবা বাতিল করারা উদ্দেশ্যে আইন প্রনয়ান সহ সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

ছ) যে সব জাতীয় দন্ড বিধান নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে সেগুলি বাতিল করা;

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, এই সনদের ২নং ধারায় নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমতার নীতি প্রতিটি দেশের জাতীয় সংবিধান ও অন্যান্য আইনের অন্তর্ভুক্তকরণ ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ এর নীতি রয়েছে। এই ধারায় বর্ণীত উত্তরাধিকার ও অভিভাবকত্ব বিষয়ে সম অধিকার এ বাংলাদেশে আপত্তি রেখেছে। এর ফলশ্রুতিতে এদেশের সকল নারীর জন্য উত্তরাধিকারের বিভেদ রয়েছে। এই আপত্তির নির্মম শিকারে পরিনত হয়েছে হিন্দু নারীরা। কেননা তাদের পারিবারিক নীতিতে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা একেবারেই সীমিত এবং নারী সন্তান দত্তক এবং অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে পুরুষের অনুমতি ছাড়া কোন অধিকারই ভোগ করতে পারে না।

নারীর অধিকার নিশ্চিত করনের জন্য এই সনদে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, পুরুষের ন্যায় নারীর মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশর সমাজে হিন্দুর জীবন পরিচালিত হচ্ছে সেই বৃটিশ আমলের আইন দ্বারাই। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণের মাধ্যমে বলা যায় যে, হিন্দু যুগোপযোগী আইন বাস্তবায়নের চেষ্টাই হচ্ছে না। কারণ হিন্দু নারীর পারিবারিক আইনের পরিবর্তন বিষয়টি কোন নারীর মানবাধিকারের বিষয় হিসেবে বিচেচিত না হয়ে বরং সংখ্যালঘুদের বিষয়ে পরিণত হয়েছে । এর ফলশ্রুতিতে হিন্দু নারীর অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের ব্যক্তি জীবনে সকল সময়েই পুরুষের অনুপকম্পার পাত্রী হয়েই জীবন কাটাতে হচ্ছে। তবে সময়ের সাথে সাথে এই ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে।

এই সনদের ৪ নং ধরার ৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, যে কোন ধরনের প্রথা যা দ্বারা নারী বা পুরুষকে একে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা উৎকৃষ্ট প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা চালান হয় তা বিলোপ সাধন করতে হবে। বাংলাদেশে এই নীতি হিন্দুদের জন্য প্রযোজ্য নয়। কেননা হিন্দু আইন বলতে বোঝায় ঐশী বধিান বা প্রচলিত প্রথা রীতি নীতি । যার কেবলমাত্র যুগ যুগান্তর ধরে চলে আসছে। এদেশের হিন্দুরাও এই প্রথা বা রীতিকে সম্মান করে আসছে তারা এর পরিবর্তনের কোন চিন্ত াই করে না।

এই সনদের ৯ নং ধারায় নারী ও তার সন্তানের পরিচিতির নীতির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের হিন্দু নারীরা তাদের সন্তান পরচিতি পায় পিতৃবংশের দ্বারা। এছাড়া কোন নারী যদি স্বামী পরিত্যাক্তা বা বিধবা হয়ে স্বামীর বাড়ির সাথে কোন অংশেই সম্পর্ক না রাখে এর পর ও তাকে এবং তার সন্তানকে স্বামীর পদবী এবং তার পরিচয় নিয়েই থাকতে হয়। একজন নারী বিবাহের পর তার স্বামীর পরিচয়ই তার পরিচয় বলে গন্য হয়। যদিও অন্যান্য সম্প্রদায়েও এই নীতির

Dhaka University Institutional Repository

ভুক্তভোগী। অন্যান্য সম্প্রদায়ের নারীর সাথে হিন্দু নারীর তুলনা করলে দেখা যায় যে, যদিও অনেক বৈদিক যুগের আইন দ্বারা তাদের জীবন পরিচালিত হলেও নারীর পরিচয়ে সন্তানের পরিচয় হয়না।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ আইনে নারী পুরুষের শিক্ষার জন্য বলা হলে বর্তমান প্রেক্ষাপট এই যে হিন্দুরা গতানুগতিক কিছু শিক্ষা কন্যা শিশুকে দিলেও, কোন কারিগরি শিক্ষা দিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। মাঠ গবেষণা হতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে বলা যায় যে, শিক্ষা কেবল হিন্দু নারীর সৌন্দর্যকে বাড়ায়।

নীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সনদে ১৩ নং ধারায় পারিবারিক কল্যাণের অধিকার রয়েছে। কিন্তু তাতে বাংলাদেশ সরকার স্বাক্ষর করেনি। এর ফলশ্রুতিতে হিন্দু নারীরা পারিবারিক কল্যাণে নিজেকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করার সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়াও সামাজিক জীবনের নানা ধর্মীয় আচরনের গন্ডিতে নিগৃত হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, পুত্র সন্তানের জন্মের পরে মুখে ভাত ও নামকরণের যে জাঁকজমক রীতি রয়েছে কন্যার বেলায় তা অনুপস্থিত। অর্থাৎ হিন্দু নারীর জন্ম হতেই শুরু হয় বৈষম্য। আর বলা যায়, কোন হিন্দু নারী কখনই দেবী পূজার পুরহিত হতে পারে না। কোন হিন্দু নারীরই উপনয়নও[10] হয়না। যদিও হিন্দু ধর্মে হিন্দু নারী পৌরহিত্য করতে পারেনা। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার নানারূপের সাধনা লব্ধ জ্ঞানের প্রসার ঘটাতে পারেন।

অর্থনৈতিক জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে হিন্দু নারীরা কোন কর্ম সংস্থানের সুযোগ পেলেও তাদের পারিবারিক অর্থনৈতিক অধিকার সীমিত। সে কারণে তাদের পিতৃ বা স্বামী সম্পত্তিতে কোন নিরঙ্কুশ অধিকার নেই। যা রয়েছে তা কেবল জীবন স্বত্ত। আবার, নারীর জীবন যৌবন যেহেতু পরিবারের পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেহেতু কর্মজীবি নারীর সকল উপার্জনেও পুরুষের অধিকার বেশি। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক বলা যায়, হিন্দু নারীকে কাজের সুযোগ দেয়াই তার প্রাপ্তি, কাজের দ্বারা প্রাপ্ত অর্থে তার অধিকার সীমিত; তবে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে বলা যায় যে, খুব কম পুরুষেরা হিন্দু নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিয়ে থাকে। তবে বেশীর ভাগ হিন্দু পুরুষ মনে করে নারী উপার্জন বা নারীর স্থাবর সম্পত্তির আয় তাদের প্রাপ্য।

এই সনদের ১৪ এ ধারায় একথা বলা হয়েছে যে, গ্রামীণ নারীর পারিশ্রমিকহীন অদৃশ্য শ্রমদান, গ্রামীণ নারীর সমস্যাসমূহ, পারিবারিক অস্তিত্বের প্রশ্নে নারীর অর্থনৈতিক কর্মে অংশগ্রহণ ও বিশেষ ক্ষেত্রে নারীর শ্রমদানে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হবে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর সমান অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি। আত্মকর্মসংস্থান, আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য সংগঠিত হওয়া ও সমবায় সংগঠনের অধিকার। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট এই যে, হিন্দু নারীর ক্ষেত্রে পারিবারিক অস্তিত্বের জন্য নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণকে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়না। গ্রামীণ জীবনে একজন হিন্দু নারী ধর্মীয়

---

[10] উপনয়ন- দেবী পূজায় পৌরহিত্যের জন্য নানা রকম ধর্মীয় বিধানের শিক্ষা।

Dhaka University Institutional Repository

কুসংস্কারের আবর্তে আবর্তীত। পুরুষরা হিন্দু নারীকে দেবীর আসনে অবস্থিত করলেও স্থান ভেদে পরিবারিক নানা রকম প্রথা এবং সংস্কারে এর বৈপরিত্য রয়েছে।

এই সনদের ১৬ নং ধরায় বলা হয়েছে শরীক রাষ্ট্রসমূহ, বিবাহ ও পারিবারিক সম্পর্ক বিষয়ক সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দুরীকরণের সকল উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং নারী পুরুষের সমতার ভিত্তিতে বিশেষ যে সব বিষয় নিশ্চিত করবে তা হলো বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদকালে একই অধিকার ও দায়িত্ব, অভিভাবকত্ব, প্রতিপালকত্ব, স্ট্রাষ্টিশীপ ও পোষ্য সন্তান গ্রহণ বা অনুরূপ ক্ষেত্রে যেখানে জাতীয় আইনে এসব ধারণা বিরজমান, একই অধিকার ও দায়িত্ব সকল ক্ষেত্রে শিশু স্বার্থই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাংলাদেশের হিন্দু নারীর বিবাহ ক্ষেত্রে কোন রেজিষ্ট্রেশন নাই, বিবাহ বিচ্ছেদও নাই, বিধবা বিবাহ আইনগতভাবে স্বীকৃত হলেও বিধবা বিবাহের প্রচলন নেই। সন্তান প্রতিপালক বা পরিবারে পুরুষের অনুমতি ব্যতিত দত্তক নেওয়ার অধিকারও নেই। এমন কি কোন কন্যা সন্তানকে দত্তক নেওয়ার অধিকারও ধর্মীয়ভাবে স্বীকৃত নয়।

খ. বাংলাদেশের সংবিধান, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও হিন্দু নারী

জাতিসংঘের মূলনীতিতে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ, সংবিধানে মহিলাদের অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে বলা হয়েছে, "জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার মৌলিক ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হইবে।" এই মূল নীতির প্রেক্ষাপটে সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অধ্যায়ে নারী পুরুষের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে নিম্নোক্তভাবেঃ

সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ভাগের ১০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।' বাংলাদেশ সংবিধানে সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগের কথা বলা হলেও পারিবারিক জীবনে হিন্দু নারীর সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ অনুপস্থিত। কেননা পারিবারিক আইনে হিন্দু নারীর অধিকার সীমিত। পারিবারিক সকল স্তরে হিন্দু নারীর অংশগ্রণ নিশ্চিত নয়।

একই অধ্যায়ের ১৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

১. সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবে;

২. মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যাবস্থা গ্রহণ করিবে।

২৮(১) ধারায় রয়েছে, কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারী পুরুষ নির্বিশেষের কথা বলা হলেও হিন্দু নারীদের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অভাব রয়েছে। সকল নাগরিকের সম্পদের সুষম বন্টনের কথা বলা হলেও বাস্তবে তা অনুপস্থিত। আজও স্বামী ও পৈত্রিক সম্পত্তিতে হিন্দু নারীর উত্তরাধিকার নেই। এমন কি আইনগতভাবে স্ত্রী ধনের উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে তা অনুপস্থিত।

একই অনুচ্ছেদের ৪২ নং ধারায় বলা হয়েছেঃ

আইনের দ্বারা অরোপিত বাধা নিষেধ- সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারন, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিরে এই আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলক ভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়াত্ব দখল করা যাইবে না।

বাংলাদেশ সংবিধানে পারিবারিক আইনের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, বা হস্তান্তরের বিলি ব্যবস্থা করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকলেও হিন্দু পারিবারিক আইনে হিন্দু নারী কখনো কোন সম্পত্তি অর্জন করলে হস্তান্তরের সুযোগ কম। আর কখনো যদিবা হস্তান্তরের প্রযোজন পরে এর জন্য আবার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বেইজিং এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্লাটফরম ফর এ্যাকশন (পি এফ এ) বাংলাদেশ কোনরূপ শর্ত ছাড়াই অনুমোদন করে। এই সনদের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার নারী উন্নয়নে জাতীয় নীতি ও কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করে। এই পরিকল্পনাকে সামনে রেখে নারীর সমতা, উন্নয়ন এবং শান্তির লক্ষ্যে সম অধিকার নিশ্চিত করতে একটি সম্মিলিত কর্মসূচি গ্রহণের জন্য এতে সমগ্র বিশ্ব ঐকমত্য প্রর্দশন করেছে। নারীর জীবনের বিভিন্ন বিষয়াবলীর মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক এবং সকল ক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করণের প্রয়োজনীয়তা এতে স্বীকৃতি পেয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের যে মূল সুরটি সমগ্র পি এফ এ জুড়ে অনুরনিত হচ্ছে তা হচ্ছেঃ

১) নারী সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নারীর সম অংশগ্রহণ।

২) সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে তাদের সমপৃক্ততা নিশ্চিত করণ।

নারীর আধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, মেধা প্রজনন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর অধিকার রয়েছে। এগুলো নারীর জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদানের বিষয় নয়, বরং মানুষ হিসেবে তাদের প্রাপ্য মৌলিক অধিকার এ ধারনাকেই সমগ্র পি এফ এ তে গ্রহণ করা হয়েছে। (নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনাঃপৃষ্ঠা ৫, ১৯৯৮)

সংবিধানের সাথে মিল রেখে বার্ষিক পরিকল্পনায় নারী সিদ্ধান্তের সম অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে কিন্তু সিধান্ত গ্রহণের সম পর্যায়ে যাবার যা যা দরকার হিন্দু নারী জন্য সে সকল অনুপস্থিত। ফলে এই সংবিধান, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যা কিছুই করা হোক না কেন পারিবারিক আইনের পরিবর্তন না হলে হিন্দু নারীর জন্য কোন কিছুই কার্যকর হবেনা। বরং নারী অধিকারের ক্ষেত্রে সনাতন এই আইনের অপপ্রয়োগ, অপব্যাখ্যাও দেওয়া হয়ে থাকে কখনো কখনো। যদিও ধর্মীয় বিধান ঠিক রেখে আইনী পরিবর্তনেরর ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশেই লক্ষ্য করা যায় কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই এর অভাব রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সার সংক্ষেপ:

সিডও সনদে যেভাবে নারী অধিকারের বিভিন্ন বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা সার্বজনীন। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ অদ্যাবিধি তার জাতীয় নীতি ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বাস্তবায়নে সক্ষম হয়নি। দুইয়ের মধ্যে ব্যাপক বৈপরিত্য বিদ্যমান। যদিও এর জন্য নারী আন্দোলন অধ্যাহত রয়েছে। তেমনি একইভাবে জাতীয় নীতিতে যে সকল পরিবর্তন, পরিমার্জন বা সংশোধন আনা হয়েছে তাও হিন্দু নারীর বেলায় পারিবারিক আইনের কারণে প্রযোজ্য হয়না। সংবিধানের সার্বজনীন ঘোষণার সঙ্গেও এই বিধানের বিরোধ রয়েছে। কেননা হিন্দু নারী আজও পারিবারিক আইনের খোলসে বন্দী। সেখানে সার্বজনীনতার বালাই নেই। সিডও সনদের আলোকে দেশের সকল ধর্মের পারিবারিক বিধানসমূহ আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা না করে নারীর সার্বজনীন মানবাধিকার অর্জন সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৫

বাংলাদেশে হিন্দু নারীর আর্থ – সামাজিক অবস্থান:
মাঠ গবেষনায় প্রাপ্ত তথ্য

বাংলাদেশের হিন্দু নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান জানতে ১০০ বিধবার (যাদের স্বামী মারা গেছে) এবং ১০০ বিবাহিত নারীর (যাদের স্বামী বর্তমান এবং বিবাহিত জীবনের বয়স ২ থেকে ২০ এর মধ্যে) তথ্য তুলে আনা হয়েছে। নমনীয় প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ কালে তাদের বয়স, অবস্থান, জীবন পদ্ধতি, তার প্রতি পরিবারের অন্যদের আচরণ ইত্যাদি লক্ষ্য করা হয়েছে। গবেষণায় যেসকল বিধবাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে সেসব বিধবাদের অধিকাংশই গ্রামের বা মফস্বল এলাকার এবং এরা অধিকাংশই নিরক্ষর বা কম লেখাপড়া জানা। এদের বেশিরভাগই হিন্দু আইন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। তবে সধবাদের মধ্যে অধিকাংশই শহর এলাকার। নিম্নে আলাদাভাবে বিধবা ও সধবাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান চিত্র উপস্থাপিত হল:

Dhaka University Institutional Repository

ক) বিধবাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান

এই গবেষণায় গ্রাম ও শহর এলাকা হতে ১০০ জন বিধবার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে যাদের নিজস্ব সম্পত্তি বলে কিছু নেই এবং কমবেশি সকলেই পরমুখাপেক্ষী জীবন-যাপন করেন। উত্তরাধিকার বঞ্চিত ৬৫% বিধবার অবস্থা একেবারেই শোচনীয় এবং উপায়ান্তহীন। এদের ভরণপোষণের ন্যূনতম কোন ব্যবস্থাই নেই। বাকী ৩৫% বিধবা স্বামীর পরিবার বা ছেলেদের উপর র্নিভর করে জীবন-যাপন করছেন। তবে এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃতভাবে যাদের আর্থিক অবস্থা ভাল সেসব পরিবারের বিধবা নারী পর নির্ভরশীল হয়েও মোটামুটি ভালভাবে জীবন যাপন করছে। এখানে আরও উল্লেখ্য পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিধবাদের মতামত কদাচিৎ গুরুত্ব পায়। তবে কোন কোন পরিবারে মাকে কর্তা হিসেবে দেখে তার মতামতের মুল্য বা তার সিদ্ধান্তের উপযুক্ত সম্মান দেয়া হয়। এটা খুব ব্যতিক্রম। উচ্চ শিক্ষিত ও সম্পদশালী হিন্দু পরিবারে মা বা শ্বাশুড়িকে যথার্থ ভরণপোষণ দেয়া হলেও বোন বা মৃত ভাইয়ের বৌয়ের দায়িত্ব পালনে অনীহা দেখা যায়। লোক লজ্জার ভয়ে তাদের সংসারে রাখা হলেও সংসারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণ থাকে না। সংসারের একজন বাড়তি লোক হিসেবে তাকে থাকতে হয়। আশ্রয় হারাবার ভয়ে নিজের দুরবস্থার কথা বাইরে প্রকাশ করেননা। অন্যের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকা এবং 'নিয়তি নির্ভর' জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এই নারীদের ৮৯% পৈত্রিক ও স্বামীর সম্পত্তির উপর নারীর উত্তরাধিকারের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে মত দেন। ৭% এর বিরোধিতা করেন। ৪% মন্তব্য থেকে বিরত থাকেন। তবে তাদের অনেকে নিজের অধিকারের চেয়ে পারবারিক ঐতিহ্য এবং পরিবারের সম্মান রক্ষার ব্যাপারে বেশী সচেতন দেখা যায়। ৩৪% মনে করেন নারী ও পুরুষের উত্তরাধিকার সমান হওয়া উচিত।

নিম্নে পরিমাণগত ও গুনগত তথ্যের ভিত্তিতে বিধবাদের অবস্থান তুলে ধরা হলো:

১. উত্তরাধিকার বঞ্চিত বিধবাদের জীবন পরাধীন ও পরমুখাপেক্ষী

হিন্দু শাস্ত্রে নারীকে দেবী হিসেবে দেখা হলেও সারা জীবন এই দেবীকে পরনির্ভরশীল করে রাখা হয়েছে। হিন্দু আইনের অধিকাংশ ধারণাই আহরিত হয়েছে মনু সংহিতা থেকে, যা কয়েকশত বৎসর আগে রচিত হয়েছিল। মনু বলেন; নারী চঞ্চলা, তার এই চঞ্চল মনকে বশীভূত করতে,

- শিশুকালে মেয়ে থাকবে বাবার অধীন;
- যৌবনে সে হবে স্বামীর অধীন এবং
- স্বামীর মরণে সে হবে ছেলেদের অধীন।

অর্থাৎ, নারী কখনই আত্ম-নির্ভরশীল হতে পারবেনা। মনু'র এই বাক্য এখনও অক্ষরে অক্ষরে অনুসৃত হচ্ছে এই সমাজে। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে নারীকে অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভরশীল করে রাখা হয়েছে। পৈত্রিক ও স্বামীর সম্পত্তির নিরঙ্কুশ উত্তরাধিকারী নয় বলে হিন্দু নারীকে সারা জীবন

সারণী ৩: বিধবাদের সম্পত্তি প্রাপ্তির চিত্র:

ক্রমিক	দাতা	সম্পত্তি	ভোগসত্ব	মোট সংখ্যা
১	বাবার সম্পত্তি	৫	-	৫ জন
২	স্বামীর সম্পত্তি	২	৪	৬ জন
৩	ছেলের কাছ থেকে		৫	৫ জন
৪	সর্বমোট	৭	৯	১৬ জন

Dhaka University Institutional Repository

পরমুখাপেক্ষী হয়ে জীবন যাপন করতে হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর পিতা বা স্বামীর পরিবারে যদি তার স্থান না হয় তাহলে পথে নামা ছাড়া গত্যন্তর থাকেনা।

বিধবাদের সম্পত্তি প্রাপ্তির চিত্র বিশ্লেষণে দেখতে পাই, ৮৪% বিধবা কোন উৎস থেকে সম্পত্তি পাননি। মাত্র ১৬% আংশিক সম্পত্তি পেয়েছেন। এই সম্পত্তি পাপ্তির উৎস আবার ৩টি। এদের মধ্যে ৫ জন বাবার কাছ থেকে সম্পত্তি পেয়েছেন। এই সম্পত্তির জন্যই তারা তাদের স্ব-স্ব অবস্থানে ভাল রয়েছেন। ৬ জন বিধবা স্বামীর সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছে। স্বামীর সম্পত্তি যারা পেয়েছেন তারা যৌথ পরিবার হতে বিচ্ছন্ন। কেননা এই সব বিধবাদের পরিজন এবং সন্তানরা তাদের ভরণ পোষণ দেয়না তাই বাধ্য হয়ে এসব বিধবারা সমাজিক ভাবে তাদের ভরণ পোষণ আদায়ের জন্য চাপ দিয়ে পরিবার থেকে সামান্য সম্পত্তি ভোগসত্ব হিসেবে পেয়েছেন। এদের মধ্যে ২ জন আছেন যাদের নাবালক সন্তান রয়েছে। তাই এই ২ জন বিধবা সম্পত্তি পুত্রের কল্যাণার্থে এবং তাদের প্রয়োজনে স্বামীর সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারবে। এই সম্পত্তি থেকে যা কিছু আয় হয় তা কেবল ঐ বিধবা এবং তার নাবালক সন্তানরাই ভোগ করে থাকে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, ৫ জন বিধবা সন্তানের কাছ থেকে ভোগসত্বের অধিকারী হয়ে সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। এসব বিধবাদের পুত্র সন্তান বর্তমান থাকতেও এরা সন্তান থেকে ভরণ পোষণ বঞ্চিত। তাই এরাও বেঁচে থাকবার তাগিদে ভরণ পোষণের পরিবর্তে সম্পত্তি চেয়ে নিয়েছেন। এই সম্পত্তির আয় থেকে তার ভরণ পোষণ চলে। এদের মধ্যে ২ জন বিধবা অলাদা ভাবে একাকী রান্না করে থাকে, আর বাড়ির বারান্দায় রাত্রি যাপন করে। অপর ৩ জনের কাজ করার ক্ষমতা নেই বিধায়, বাড়ির অন্যান্য সড়িকদের সাথে ভোগ সত্বের সম্পত্তির বিনিময়ে ভরণ পোষণ পেয়ে থাকে।

সারণী ৪ "পৈত্রিক সম্পত্তিতে ছেলে মেয়ে উভয়ের সমান অংশীদারিত্ব থাকা উচিত" এসম্পর্কে বিধবাদের মতামত

ক্রমিক	মতামত	জন
১	সমর্থন করেন	৮৯
২	বিরোধিতা করেন	০৭
৩	মন্তব্য হতে বিরত থাকেন	০৪
৪	মোট	১০০

সারণী ৪ এ উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ে উভয়েরই সমান অংশিদারিত্ব থাকা উচিত বলে মনে করেন ৮৯% বিধবা। ৭ জন বলেন, যুগ যুগ ধরে যে নিয়ম চলে আসছে এর কোন পরিবর্তন ঘটলে ব্যাক্তি জীবনে সংঘাতের পরিমাণ বেড়ে যাবে। তাই সংঘাতময় জীবনের দিকে না যেয়ে পুরুষের অধীনে মেয়েদের থাকাটাই নিরাপদ। এ বিষয়ে মন্তব্য হতে বিরত থাকেন ৪ জন। এরা মনে করেন ছোট এই বৈধব্য জীবনে নানা ঘাত প্রতিঘাতে জর্জরিত; এর উপরে যদি নারী পুরুষ সমানাধিকারের বিযযে কথা বলেন, তবে কোন দিক হতে আরও প্রতিঘাত আসবে তা বোধগম্য নয় বিধায় এই বিষযে তারা মন্তব্য দিতে অস্বীকৃতি জানান।

Dhaka University Institutional Repository

২. অনিশ্চয়তা বিধবাদের সঙ্গী

সারণী ৫: বিধবাদের বর্তমান বয়স:

ক্রমিক	বয়স	জন
১	২৫-৪০	১২
২	৪১-৬০	৩৫
৩	৬১-৮০	৪৩
৪	৮১-১০০	১০
৫		১০০

সূত্র: মাঠ পরিদর্শন

বিধবা নারীকে অনিশ্চিত ও নিরাপত্তাহীন জীবন যাপন করতে হয়। নিঃসন্তান বিধবাদের জীবন আরও অনিশ্চিত। নীলা হালদার (৭০), নাবালক বয়সে বিয়ে হওয়ার পরপরই বিধবা হন, ছেলে-পুলে নেই। স্বামীর মৃত্যুর পর প্রথমে স্বামীর বাড়িতে কিছুদিন তারপর পিতার কাছে আশ্রয় নেন। বাবার মৃত্যু হলে কাকার ছেলেরা তার বাবার সম্পত্তি করায়ত্ব করে। মার সাথে কাজ করে বাবার ভিটাতে থাকার সুযোগ পান। মায়ের মৃত্যুর পর নীলা শেষ আশ্রয়টুকু হারান। এক বাড়িতে কাজের বিনিময়ে আশ্রয় পান। সেখানেই আছেন প্রায় ৪০/৪৫ বছর যাবৎ। তাদের সংসারই এখন নিজের সংসার, তাদের সন্তানই নিজের সন্তান হিসেবে বড় করেছেন। কাজের বিনিময়ে কোনদিনও কারো কাছে কিছু চাননি তিনি। আজ যখন বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন, বুঝতে পারছেন আজ তার আর সংসারে প্রয়োজন নেই। আজ ভাবেন তিনি যদি কাজের বিনিময়ে ধন সম্পদ চাইতেন তাহলেও তার নিজের বলে কিছু থাকতো। আজ শুয়ে শুয়ে কেবলই চোখের জলে ভাবেন আজ যদি তার নিজের কোন জায়গা-জমি বা অন্য কোন ধন থাকতো তাহলে তাকে এরকম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে হতোনা। এত বড় পৃথিবীতে একখন্ড জমিও তার নামে নেই। সারণী ৫ এ বিধবাদের বর্তমান বয়স তুলে ধরা হয়েছে। এদের মধ্যে ১২ জনের বয়স ২৫ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে, ৪১-৬০ পর্যন্ত যাদের বয়স তাদের সংখ্যা হল ৩৫ জন, ৬১-৮০ বছরের নারী আছেন ৪৩ জন, ৮১-১০০ বছর বয়সের আছেন ১০ জন। তুলনামূলকভাবে বয়োবৃদ্ধাদের অবস্থাই বেশি নাজুক।

৩. পারিবারিক সিদ্ধান্তে বিধবাদের মতামতের মূল্য নেই

পরিবার-পরিজনের কাছে একজন বিধবা যেন ফুড়িয়ে যাওয়া একজন বাড়তি মানুষ। সমাজ ব্যবস্থা এমন, যে ব্যক্তি সংসারে অর্থ যোগানে ভূমিকা রাখতে পারে যে কোন বিষয়ে তার অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে, কথার মুল্য থাকে। হিন্দু বিধবারা যেহেতু অর্থ সম্পদের মালিক নন এবং সংসারে নগদ অর্থের যোগান দিতে পারে না তাই সংসারের কোন সিদ্ধান্তে তার মূল্য দেওয়া হয়না। অধিকার নেই স্বাধীন মতামত প্রকাশের। কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা গেলেও তা নগণ্য। সংসারে একজন বিধবার কায়িক শ্রমকে মূল্যায়ন করা হয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। রেনুকা বালা, স্বরস্বতী, শিখা দেবী, সুমালা দেবী, পুষ্পরানীর মতো অনেকেই এজন্য ভাগ্যকে দোষারোপ করেন। স্বামী মারা যাবার পর তারা হয়ে যান কেবলই সংসারের দাসী, কখনোবা বোঝা তাই তার কোন মতামতের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়না।

জনৈকা বিধবার দুঃখ ভরা আর্তি, "যাদের জন্য জীবন বিলিয়ে দিয়েছি- নিজে না খেয়ে খাইয়েছি, যাদের মুখের হাসি ফোটাতে নিজের হাসি বিসর্জন দিয়েছি, স্বামী স্বর্গবাসী হতে না হতেই সেই সন্তানদের কাছে আমি বোঝা হয়ে গেছি। আমার চির চেনা পৃথিবী, চির চেনা মানুষেরা অচেনা হয়ে গেছে, পর হয়ে গেছে।"

Dhaka University Institutional Repository

৪. আইনগতভাবে সিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বিধবা বিবাহ এখনও খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয়

রাজা রাম মোহন রায়ের প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালে প্রবর্তিত বিধবা বিবাহ আইন (বিধবা বিবাহ এ্যাক্ট ১৮৫৬) বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া সত্ত্বেও তা এখানে অনুসৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল। যদিও ভারতে বিধবা বিবাহের প্রচলন রয়েছে। এদেশের সামাজিক ব্যবস্থায় বিধবা বিবাহকে এখনও পাপ হিসেবে গণ্য করা হয়। এছাড়াও আরও একটি সমস্যা হল স্বামীর মৃত্যুর পর ঐ বিধবার নির্দিষ্ট কোন আভিভাবক বা তার নিজের কোন সম্পত্তি না থাকার কারণে কোন পুরুষই তাকে গ্রহণ করতে সম্মত হয়না। এর উপর যদি থাকে সন্তান তাহলে পুনঃবিবাহের সমস্ত পথই বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া '৫৬ সালে প্রবর্তীত হিন্দু আইন অনুযায়ী কোন হিন্দু বিধবা নারীর বিয়ে হলে মৃত স্বামীর দ্বারা প্রাপ্ত সমস্ত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি পূর্ব স্বামীর স্বগোত্রীয়দের কাছে ফেরত দিতে হয়। আমাদের সমাজে একজন বিধবাকে ঘরের বধূ হিসেবে বরণ করে নেওয়ার মতো উদার পরিবার খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বিধবাকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে বিয়ে না করার নজীর অহরহ। আবার ভালবেসে বিধবা বিয়ে করে ঘরে তোলায় সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে এমন ঘটনাও আছে। বিধবার জন্য আরো একটি কারণে দ্বিতীয় বিয়ে করা দুষ্কর-মৃত স্বামীর উত্তরাধিকারীরা কখনও তা মেনে নেয় না, পরিবারের জন্য সম্মানহানিকর বলে মনে করে।

বিধবা বিবাহ যে সুদৃষ্টিতে দেখা হয় না তা তাদের পোশাক রীতি থেকেও স্পষ্ট। বিধবাদের শুভ্রবসন পরিধানের পেছনের কারণটি অনেকের মতে "অমানবিক"। মূলত পুণর্বিবাহ রোধ কল্পেই তাদের উপর এই পোশাক চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। দু'টি কারণে তাদের রঙ্গিন পোশাক পড়তে দেওয়া হয় না, এক. তার উপর যেন কোন পুরুষের নজর না পড়ে, দুই, বিধবার চিত্ত যাতে চঞ্চল না হয়। অথচ পুরুষের ক্ষেত্রে কিন্তু এমন কোন অমর্যাদাকর, অমানবিক সামাজিক বিধান নেই! **তাইতো এখনও বিধবার কণ্ঠে শোনা যায়, "বিধি জন্ম লিখলি, মৃত্যু লিখলি, বিধবার বিয়ে কেন লিখলি না, তোর কলমে কি কালি ছিলনা?"** (সংগৃহীত)

৫. যৌতুক প্রথার কুফল

অনেক ক্ষেত্রে নারীকে মনে করা হয় বোঝা। আর এ কারণেই যখন এই বোঝা পিতার গৃহ থেকে স্বামীর গৃহে স্থানান্তরিত হয় তখন স্বামীর পিতা-মাতাকে 'ক্ষতিপূরণ!' প্রদান করতে হয়। এই ক্ষতিপূরণকে বলা হয় যৌতুক। যৌতুকের চিন্তা করে অনেক পিতা-মাতা মেয়েদের পড়াশুনার পেছনে অর্থ ব্যয় না করে সেই অর্থে বাল্যেই কন্যাকে পার করে দেয়। বিষয়টি এমন যে, বিবাহের সময়ে এত কিছু দিতে হবে তাহলে পড়াশুনা করিয়ে লাভ কি ? বেশিদিন ভরণপোষণ করেই বা কি হবে? এ কারণে এক ধরনের 'আপদ বিদেয়' করার মানসিকতা থেকে অল্পবয়সেই কন্যার বিয়ে দেয়া হয়। গ্রাম্য প্রবাদ প্রবচনেও এর প্রমান মেলে "মাইয়া যাবি খাইয়া আরও যাবি নিয়া।" কোন এক বাঙ্গালী পন্ডিতের নারীর সঙ্গায় আরও প্রমান মেলে "ঐ যায়, ঐ যায় বাঙ্গালীর মেয়ে, খেয়ে যায়, নিয়ে যায়, আরও যায় চেয়ে।"

Dhaka University Institutional Repository

৬. বিধবাদের মধ্যে দেশত্যাগের প্রবনতা রয়েছে

বাংলাদেশে তাদের আর্থিক অনিশ্চয়তা এবং ভারতের বিধবানুকূল আইন বিধবাদের ভারতমুখী হবার পেছনে দু'টি কারণ। যখন বিধবা নারী স্বামী- পিতা কারো সংসারেই আশ্রয় পাননা তখন বাধ্য হয়েই ভারতে চলে যান। ননীমালা মধু, মানসি মন্ডল, রেনু মন্ডল ওনারা ভারতে চলে গিয়েছেন চিরতরে। শেফালি দে, সরলা বিশ্বাস, আমুদিনি হালদার ওনারা সন্তান এবং ভিটার মায়ায় ফিরে এসেছেন। ডলি, ঝর্না, কাঞ্চণ, রেনুকা, শিখা, অঞ্জলী, কবিতা, শেফালী, জোসনা, দুলি রানী, স্বরস্বতী রানী, রিতা, কনক লতা, স্মৃতি এদের প্রত্যেকের বয়সেই ২৫ হতে ৪০ এর মধ্যে। এরা সকলেই ভারতে চলে যাবার পরিকল্পনা করছেন। কেউ পুনর্বিবাহের জন্য কেউ সন্তানের স্বাভাবিক জীবনের স্বার্থে ভারতে পাড়ি জমান। তাদের বক্তব্য হল ওখানে আর কিছু না হোক একটা স্বাভাবিক জীবন পাওয়া যাবে, যা এখানে সম্ভব নয়। এছাড়া বাল্য বিধবা যার কোন সন্তান নেই এবং যাদের বাবা মা রয়েছেন, তারা কন্যাকে পুনরায় বিবাহ দেবার জন্য ভারতেই পাঠান। কেননা তারা মনে করেন মেয়ে ওখানে বিয়ে দেয়া যাবে। যা বাংলাদেশে সম্ভব নয়।

৭. সামাজিক ও ধর্মীয় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বিধবাদের উপস্থিতি কাঙ্খিত নয়

বিধবাকে অপয়া হিসেবে গণ্য করা হয়। গ্রামীণ সমাজে এখনও এই বিশ্বাস প্রবল যে, সতী নারী হাতে শাঁখা, সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে মারা যায়"। অর্থাৎ, অসতীদের স্বামীরা অকালে আগে মারা যায়। স্বাভাবিক কারণেই স্বামীর মৃত্যুর জন্য এদেরকে দায়ী করা হয়। যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠান বা মাঙ্গলিক ব্যাপারে (বিয়ে অনুষ্ঠান, নবজাতক স্পর্শ পুজা পার্বন ইত্যাদি) বিধবাদের উপস্থিতিকে অমঙ্গল হিসেবে গণ্য করা হয়। রীতা ঘোস বলেন "স্বামী মারা গেছে আজ দুই মাস হতে চলল, তার পর আমাকে আর ঠাকুর ঘরে ঢুকতে দেয়া হয়না। স্বামীর চিতাই আমার ঠাকুর ঘর নির্ধারিত হল।" কাঞ্চনী ঘোষ বলেন "আমিতো এমনিতেই অপয়া আমাকে কেন আর মঙ্গল কাজে লাগবে।" শুধু তাই নয়, স্বামীর মৃত্যুসহ সবকিছুর জন্য বিধবাকে দায়ী করা হয়, তার পদে পদে দোষ।

৮. বিধবাদের মেয়ের বিয়ের পাত্র পাওয়া দুষ্কর, স্বামী পরিত্যাক্ত হওয়ার ঘটনা বেশি

বিধবা সুভাসি হালদারের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মেয়ে রীনা বলেন, "আমরা ছোট বেলা হতেই খুব কষ্টকরে পড়াশুনা করছি। আমরা আমাদের বাবার কোন সম্পত্তি পাবনা, আমাদের ভাল কোন জায়গায় বিয়েও হবেনা ।" কেন? জানতে চাইলে বলেন, "আমাদের তো ভাই নেই, বাবা নেই, আমাদের বিয়ে করবে কে ? মা তো পড়াশুনা করাতেই বাবার সব সম্পত্তি শেষ করেছে, বিয়ের সময়ে ভাল কিছু দিতে পারবেনা। তাছাড়া যদিবা কোন ভাবে বিয়ে হয় তবে আমরা কোনদিনও সুখের মুখ দেখবনা, মার সাথে কোন যোগাযোগ রাখতে পারবো না। আমার মা'র তখন কি হবে? " বিধবার মেয়েরা শ্বশুর বাড়িতে বেশিমাত্রায় নির্যাতনের শিকার। "আমার বাবা-ভাই নেই বলে সারাক্ষণ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা পোহাতে হয়। বাবা-ভাই থাকলে এতো নির্যাতন করার সাহস পেতো না শ্বশুর বাড়ির লোকেরা।" এখানে উলেখ্য, কারো কারো পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বিধবা মায়ের কন্যা সন্তানের স্বামী পরিত্যক্তা হওয়ার ঘটনা বেশি।

Dhaka University Institutional Repository

৯. বিধবাদের হাতে সম্পত্তি নিরাপদ নয় বলে মনে করা হয়

বিধবাদের সহায়-সম্পত্তি দখলের জন্য চলে নানান ষড়যন্ত্র। হিন্দু পারিবারিক আইন অনুযায়ী কোন স্বামী নাবালক পুত্র সন্তান রেখে মারা গেলে তার স্ত্রী ছেলে সাবালক হওয়া পর্যন্ত স্বামীর সম্পত্তির নিরঙ্কুশভাবে ভোগস্বত্বের অধিকারী। ছেলে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর পৈত্রিক সম্পত্তির মালিক হয়। কিন্তু বিধবা রেনু ও তার ছেলের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটে নি। স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশুর বাড়ি থেকে বাবার বাড়ি আশ্রয় নেন তিনি। অন্যদিকে চতুর দেবর সব সম্পত্তি দখল করে নেয়। ভাইয়ের স্ত্রী এবং ভাইয়ের ছেলেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে। সব দিক থেকে তাকে এমনভাবে বঞ্চিত করা হয় যে দেশে টিকে থাকাই দায় হয়ে ওঠে। অবশেষে 'মনের দুঃখে বনে যাওয়া'কে শ্রেয় মনে করে কিশোর ছেলের হাত ধরে অনেকটা সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় পাড়ি জমান ভারতে। সরলা ঘরামীও পারিবারিক ষড়যন্ত্রের শিকার। স্বামী থাকতে যে নারী 'জলের পরিবর্তে তেল দিয়ে রান্না করতেন' বলে কথিত আছে, স্বামীর মৃত্যুর পর সেই বৈভবশীলা নারী পারিবারিক ষড়যন্ত্রে সব হারিয়ে বনে গেছেন নিঃস্ব। জীবন সায়াহ্নে উপনীত এই বৃদ্ধাকে মন্দিরের ভিক্ষান্ন খেয়ে জীবন ধারণ করতে হচ্ছে। অপর দিকে বিধবা স্মৃতি ভক্ত'র ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা ঘটেছে। তার ছেলে লিটন ভক্ত বলেন " আমার ৬ মাস বয়সে মামা যদি আমার দায়িত্ব না নিতেন তাহলে আমার আর পড়াশুনা হতোনা। আজ পর্যন্ত বাবার মৃত্যুর পর আমার কাকা-জ্যাঠাদের কাছ থেকে এক টুকরা কাপড়ও পাইনি। আজ আমি সব বুঝি। কিন্তু যা দখল হয়ে গেছে তা উদ্ধার করতে গেলে আমাকেই জীবন হারাতে হবে।

১০. শুধু বিধবাদের নয়, তাদের সন্তানদের জীবনও অনিশ্চিত

বিধবা মায়ের সন্তানদের জীবনও অনিশ্চিত। স্বামী মারা গেলে এমনিতেই হিন্দু বিধবা আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে, এর উপর আর কোন আর্থিক নিশ্চয়তা থাকেনা। বিধবারা নাবালক সন্তানকে যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য আত্মীয়দের কাছ থেকে সাহায্য পান কম ক্ষেত্রেই। বরং উল্টো স্বামী পক্ষের লোকজন চান সন্তানসহ ঐ বিধবা স্বামীর বাড়ি ছেড়ে চলে যাক। এই সময়ে বাবার বাড়ি হতে যদি কোন আশ্রয় বা সাহায্য বিধবা নারী পান তাহলে সে কোন রকমে জীবনধারণ করতে পারেন অন্যথায় তাকে সন্তানসহ পথে নেমে যেতে হয়। এর কু-প্রভাব অনেক সময় ঐ সন্তানের উপর পড়ে। পিতৃ পরিচয়হীন ঐ সন্তান পূর্ণবয়স্ক হয়ে মাকে দেখেননা সমাজের জন্যও হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। শুধুমাত্র বাবা ও স্বামীর উত্তরাধিকারী হিন্দু নারী নয় বলে তার সন্তান এ সমাজের যোগ্য নাগরিক না হয়ে বরং সমাজের বোঝা বা হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ভুক্তভোগী ঝর্না দত্ত বলেন, "আমাদের সমাজটি এত বেশী সংস্কার আঁকড়ে আছে যে আমি নয় আমার মেয়েদেরও সারা জীবন আমার বিধবাত্বের পাপের বোঝা (!) বয়ে বেড়াতে হবে। " তার দু'টি মেয়ে। স্বামী বাংলাদেশ ব্যাংকে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। স্বামী যতদিন ছিলেন ততদিন তিনি ভাল ভাবেই সংসারের কর্তৃত্ব করেছেন। কেননা তার স্বামী সংসারের বড় একটা অংশ সংসারের খরচ দিতেন । স্বামীর মৃত্যুর পর তার দুর্ভাগ্য শুরু হয়। তার দুই মেয়ে নিয়ে শ্বশুর বাড়ির লোকজন স্বামীর সম্পত্তি ভোগ করার কোন সুযোগ না দিয়েই বাবার পরিবারে পাঠিয়ে দেন বাবা-মাসহ সংসারের যাবতীয়

Dhaka University Institutional Repository

খরচ ভাই চালান। তার উপর সন্তানসহ বোনকে আশ্রয় দিতে ভাই অস্বীকৃতি জানান। বাবা মায়ের অনুরোধে তাকে কিছুদিন থাকার অনুমতি দেন। ওখানে থেকেই চেষ্টা করেন চাকুরির । তার দুর্ভাগ্য দেখে স্বামীর অফিসের কর্মকর্তারা তাকে তাদের অফিসেই তাকে চাকুরি দেন। বাড়ি ভাড়া করে মেয়েদের নিয়ে থাকেন। মেয়েদের স্কুলে দেন। সেখানেও তাকে নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। মেয়েদের নিয়ে এক যুবতী মার এই সমাজে কোন আভিভাবক ব্যতীত কত কষ্টে জীবন যাপন করতে হয় তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। মেয়েরা আজ বড় হয়েছে, এও এক যন্ত্রনা। তাদের জন্য উপযুক্ত পাত্র খুঁজে পাওয়া সম্ভব হচ্ছেনা। সার্বক্ষণিক এক দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকতে হচ্ছে ঝর্নাকে। বিধাব মায়ের এই মেয়েরা যে স্বামীর ঘরে গিয়ে সুখে থাকবে এরও নিশ্চয়তা নেই। ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা তাকে প্রতিনিয়ত কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে।

১১. বর্ণ প্রথা বিধবাদের জন্য আরেক সমস্যা

হিন্দু সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারটি বর্ণে বিভক্ত। বিধবা প্রত্যেক বর্ণে থাকলেও সবদিক থেকে খারাপতর অবস্থায় আছে ব্রাহ্মণ বিধবারা। বর্ণ প্রথার কারণে তারা অন্যের বাড়িতে কাজ করতে পারেন না । শুধু তাই নয় বিধবা ব্রাহ্মণ হলে অন্য বর্ণের লোকজনও তাকে কাজে নিতে চায় না। বিশ্বাস যে, ব্রাহ্মনদের দিয়ে গৃহের কাজ করালে পাপ হবে।

বিবাহের ৩ বছরের মাথায় স্বামী মারা যায় চেলীর। দেড় বছরের কন্যাকে নিয়ে বাবার বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। কায়িক শ্রম বিক্রির উপায় নেই। সেখানে প্রতিনিয়ত গঞ্জনা সইতে হচ্ছে তাকে। বয়স ২৫ হলেও পুনরায় বিয়ের সম্ভাবনা নেই। কেবলমাত্র ব্রাক্ষ্মন বিধবা নারী হবার কারনেই চেলীর জীবনে আজ এতটা নিরাপত্তহীন। শুধু চেলীর জীবনই নয় তার কন্যার জীবনও অনিশ্চিত।

এই গেল এক দিক। আরেকটি তথ্য হচ্ছে, বর্ণ ও সামাজিক প্রথার কারণে, কায়স্থ বিধবারা প্রয়োজনেও স্বামীর সম্পত্তি বিক্রি করতে পারেনা। ভুক্তভোগী কায়স্থ বিধবা মনু ও শান্তিবালা বলেন, "আমাদের মধ্যে সম্পত্তি বিক্রির রীতি নেই, তবে দান করা যায়। সন্তানদের পড়াশুনার খরচ চালানোর জন্যও সম্পত্তি বিক্রি করতে পারিনি। সম্পত্তি দান করে অন্যের দয়ায় নিজের পুত্রদের পড়ালেখা শিখিয়েছি।"

১২. সংসারে বিধবাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার মূল্য নেই

সংসারে বেশিরভাগ বিধবারই ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন গুরুত্ব নেই। একজন বিধবা চাইলেও তার ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন না। এজন্য তাকে অন্যের কাছে (যদি সে ছেলেদের সঙ্গে থাকে) হাত পাততে হয়। ছেলেদের কাছে বিমুখ হলে তার কিছু করার থাকে না। যেমন ছেলের সংসারে থেকে একজন বিধবা তার বিবাহিত কন্যার জন্য কিছু করতে চান বা তার নাতি নাতনি বা অন্য কারো প্রয়োজনে কিছু একটা দিতে চান, এজন্য তাকে ছেলের কাছে হাত পাততে হবে। ছেলে যদি না দেন বিধবার কিছু করার থাকেনা। এভাবে তাদের অনেক ইচ্ছার মৃত্যু হয় প্রিয়জনের কাছে। নিজের আর্থিক

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গতি থাকলে এমনটি ঘটত না এটা বলাই বাহুল্য। উদাহরনঃ চন্দ্রকলার ২ মেয়ে ১ ছেলে। ছেলে মেয়েদের খুব ছোট রেখে চন্দ্র কলার স্বামী মারা গেলে, বড় কন্যাকে বিবাহ দিয়ে স্বামীর সম্পত্তি ধরে রাখেন এবং ছেলেকে পড়ালেখা শেখায়ে বড় করেন । এখন ছেলে তার আয় করে কিন্তু বড় বোন যে তাকে বাবার আদরে বড় করেছে তার কোন প্রয়োজনে চন্দ্রকলা কিছু দিতে গেলে ছেলের অনুমতি লাগে, শুধু তাই নয় তিনি যদি ছেলের অনুমতি ব্যাতিরেকে কিছু তার নাতি নাতনিদেরও দেন তবে তাকে ভরনপোষনের ভয়ে সর্বক্ষন তটস্থ থাকতে হয়। এর আরো উদাহরনঃ শান্ত, মনু, সুমালা, সুমতি, আয়নামতি, কমলা,স্বরস্বতী, নীলা, উষা এদের মতো আরো অনেকের অবস্থাই একরকম।

১৩.স্ত্রীধন বলে বাস্তবে কিছু নেই

প্রাচীণকালে স্বামীর বাড়িতে কন্যার যাতে কোন কিছুর অভাব না হয় সেজন্য পিতার গৃহে সম্প্রদানের সময় কন্যার যা কিছু প্রয়োজন তা সব কিছুই সঙ্গে দিয়ে দিতেন। দাস দাসী পর্যন্ত দিয়ে দেওয়া হতো। বর্তমানে দান হিসেবে দেয়া টাকা, গৃহসামগ্রী যা স্বামী এবং স্বামীর পরিবার তাদের প্রাপ্য বলে ধরে নেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিয়েরপূর্বে বরপক্ষ এসব জিনিসপত্রের প্রতিশ্রুতি কনেপক্ষের কাছে আদায় করে নেয়। এজন্য পিতা যে সমস্ত জিনিসপত্র দান করেন তা কন্যা তার বলে ধরে নিতে পারেনা। ফলে স্বামীর অবর্তমানে বিধবা ঐ সংসারে তার বলে কিছুই পাননা। এতে তাকে পরমূখাপেক্ষী হয়ে জীবনযাপন করতে হয়। কুটিলা ঘরামি, কাঞ্চন, রেনুকা, সুমতি বাড়ৈ, ইন্দুমতি রায়, শান্ত লতা হালদারসহ আরও অনেকের মত এই যে আজ যদি নিজের বলে কিছু থাকতো তবে তাদেরকে এতটা অবহেলার শিকার হতে হতো না। শিক্ষিত অবস্থাপন্ন ঘরের প্রায় ১০০ বছরের শান্ত লতা ও বলেন" আজ যদি আমার কিছু নিজস্ব থাকতো তবে আর আমার জীবিকা নির্বাহের জন্য ছেলেদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করতে হতো না।"

১৪.নিঃসন্তান বিধবারা সমাজে আশ্রয়হীণ হয়

নিঃসন্তান বিধবাদের সমাজে কোন আশ্রয় থাকে না । বিশেষ করে তার শেষের জীবনে তাকে হয় ভিক্ষে করে খেতে হয় নতুবা তার উপার্জিত অর্থ অন্য কাউকে উৎসর্গ করে নিজের ভরণপোষণের কাজ চালাতে হয়। রানী ভট্টাচার্য তাই বললেন, সারা জীবন মাস্টারি করে যা পেয়েছি ভাইয়ের সন্তানদের পেছনে খরচ করেছি তখন যদি বুঝতাম অমার আজ এই হবে তা হলে আমি নিজের জন্য আরও কিছু করতাম। পাচি, ভালোবাসি ওনারা ভিক্ষে করেই জীবন ধারন করছেন। ননীবালা, গৌরি, চিত্রা, লীলা, সংকরী ওনারা ভরণপোষণ বঞ্চিত হয়ে পিতৃ প্রদত্ত বা স্বামীর পক্ষ হতে কোন উপায়ে কিছু সম্পত্তির

সারণী ৬: বিধবাদের বর্তমান অবস্থান:

ক্রমিক	বর্তমান অবস্থান	সংখ্যা
১	বাবার বাড়ি	১০ জন
২	স্বামীর বাড়ি	৩৫ জন
৩	ছেলের আশ্রয়ে	৩৫ জন
৪	মেয়ের আশ্রয়ে	৪ জন
৫	মন্দিরে/অন্যের আশ্রয়ে/কর্মস্থলে	১৬ জন
৬	সর্বমোট	১০০ জন

সুত্রঃ মাঠ পরিদর্শন

Dhaka University Institutional Repository

মালিক হয়ে তার বিনিময়ে ভরণপোষণ পাচ্ছেন।

বিধবাদের বর্তমান অবস্থান বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১০% বাবার বাড়ি, ৩৫% স্বামীর বাড়িতে, ৩৫% ছেলের আশ্রয়ে, ৪% মেয়ের আশ্রয়ে, ১৬% মন্দিরে বা অন্যের আশ্রয়ে বা কর্মস্থলে বসবাস করছেন। যেসকল বিধবা বাবার বাড়িতে অবস্থান করছেন তাদের বেশিরভাগই পৈত্রিক সম্পত্তি পেয়েছেন কেননা তাদের কারো ভাই বা অন্য ওয়ারিশ নেই। কারোর বাবা ইচ্ছাকৃত ভাবে মেয়ে জামাইকে সম্পত্তি দান করে গেছেন। কারো ক্ষেত্রে দেখা গেছে কন্যা ভাই থাকতেও বাবার ভরণপোষণ দিয়েছেন তাই বাবা খুশি হয়ে কন্যাকে সম্পত্তির সামান্য অংশ কন্যার নামে দান করেছেন। যারা স্বামীর বাড়িতে সন্তানসহ পরিজনদের সাথে থাকছে এদের মধ্যে কয়েকজন বিধবা নারী অল্প বয়স্ক এবং তাদের সন্তানরা নাবালক। যারা ছেলের আশ্রয়ে রয়েছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই সংসারের একজন বাড়তি মানুষ হিসেবে কোন রকমে টিকে আছেন। যারা মেয়ের আশ্রয়ে রয়েছেন তাদের মধ্যে বেশিরভাগেরই ছেলে সন্তান নেই। তাই বাধ্য হয়েই মেয়ের আশ্রয়ে রয়েছেন। ছেলে ভরণপোষণ দেয়না বলেই কন্যার কাছে আশ্রয় নিয়েছেন এমনও রয়েছেন।

বিধবাদের একটি বড় অংশের শেষ আশ্রয় মন্দির বা আখরা। এখানে যেসব মহিলা পূজারী স্থায়ীভাবে থাকেন তাদের প্রায় সকলেই বিধবা। এদেরকে মন্দিরে ধোয়া-মোছা ও পুরোহিতের সহায়তাকারী হিসেবে থাকতে দেওয়া হয়। যারা মন্দিওে বা অন্যত্র থাকেন তাদেও বেশিরভাগই পারিবারিকভাবে সহায়-সম্বল নেই। তবে নিকট জনের কাছ থেকে কষ্ট পেয়ে সংসার ছেড়েও অনেকে মন্দির বা অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন।

সাধনা, মানিক্য, দুলালী, প্রমিলা, পারুল, কনকপ্রভা, স্বরস্বতী, উষারানী, প্রিয়বালার মতো অনেককেই মন্দিরে বা আখড়াতে নিয়মিত পাওয়া যায়।

১৫.শ্বাশুড়ি থাকলে পুত্রবধুকে ভোগ-সত্ত্বের মালিক করা হয়না

শাশুড়ি এবং পুত্রবধূ উভয়েই যে সংসারে বিধবা সে সংসারে ভোগসত্ত্বে পুত্রবধূ স্বামীর সম্পত্তির মালিক এটা আইনগতভাবে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও তাকে তা হতে বঞ্চিত করা হয় । কেননা স্বামী পক্ষের লোকজন বা ঐ শাশুড়িও চিন্তা করেন পুত্রবধূকে ঐ বাড়ি হতে বের করে দেওয়া হলে তারা এ সম্পত্তির মালিক হতে পারবেন । সংকরি দেবী তাই বললেন "আমি নিঃসন্তান আমাকে তাড়ানোর জন্য আমার কাকা শ্বশুর শাশুড়ির নামে স্বামীর সম্পত্তির ভোগসত্ত্বের মালিক করলেন আমকে বাদ দিয়ে। এখন আমি কোথায় আশ্রয় পাই, আমি ভুমি অফিসে মামলা করেছি এর বিরুদ্ধে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমি মামলা লড়তে পারবনা, কেননা আমার পক্ষে মামলা লড়বার কোন লোক নেই । বাবা নেই, ভাই লন্ডন থাকেন। ভাই যদিও টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন তাকে তবু লাভ হবেনা। এই ২৫ বছর বয়সেই চারদিক কেমন অন্ধকার হয়ে উঠেছে আমার।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. বাল্য বিবাহের কুফল

সারণী ৭: বিধবাদের বিবাহের বয়স

ক্রমিক	বিবাহের বয়স	জন
১	৫-১০	২২
২	১১-২০	৭২
৩	২১-৩০	০৬
৪		১০০

সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন

সারণী ৭ এ হিন্দুদের মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে হওয়ার বাস্তব অবস্থা ফুটে উঠেছে। সারণীতে দেখা যায় তথ্যদাতা বিধবাদের ২২ জনেরই বিয়ে হয়েছে যখন তাদের বয়স ছিল ৫-১০ বছরের মধ্যে। এই বিধবাদের প্রত্যেকেরই বর্তমান বয়স ৭০ উপরে। ১১-২০ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে ৭২ জনের। তবে এই ৭২ জনের মধ্যে ১২-১৮ বছরের বয়সেই বেশীরভাগের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। ২১-৩০ বছরের বয়সে ৬ জন নারীর বিবাহ হয়েছে। এরা সকলেই সম্প্রতি বিধবা হয়েছেন। মঙ্গলী রানী, সুখী রানী, ইন্দুমতি, সুমালা, সরলা, পুষ্পরানী, লক্ষীরানী, ননীমালা, নিরুদাসী, নীলা, শেফালী, আয়নামতি এরা সকলেই বাল্য বিধবা। সামাজিক প্রেক্ষাপট এমন যে, এদের কেউই দ্বিতীয় বিয়ের কথা চিন্তা করেননি। বাংলাদেশের হিন্দু মেয়েরা তুলনামূলকভাবে কম বয়সে বিধবা হয়। এজন্যও সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা দায়ী। নিরাপত্তার অভাবে অধিকাংশ অভিভাবক প্রাপ্তবয়স্ক না হতেই মেয়ের বিবাহ দেয়। বিশেষকরে যাদের আর্থিক অবস্থা প্রান্তিক তারা কন্যাকে বাল্য বয়সে বিয়ে দেন। তারা মনে করে মেয়ে বিবাহ দেবার উপযুক্ত বয়স যখন ১৫/১৬। এই বয়সে কন্যার জন্য ভাল প্রস্তাব আসে। ফলে দেখা যায় কন্যার বয়সের দ্বি-গুন বা তিন গুন বয়সের পাত্রের হাতে কন্যাকে সম্প্রদান করা হয়। এতে অল্প সময়ের ব্যবধানে কন্যা বিধবা হয়ে যান ।

খ. সধবাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান

গবেষণায় ১০০ জন হিন্দু বিবাহিত নারী অর্থাৎ, সধবার (যাদের স্বামী বর্তমান রয়েছে) তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য দাতাদের কাছ থেকে পরিমাণগত এবং গুণগত উভয় ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ৯৬% সধবাই পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায়নি। মাত্র ৪% সধবা পৈত্রিক সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। পৈত্রিক সম্পত্তি পাওয়ার প্রশ্নে সধবা হিন্দু নারীদের ৫২% মনে করেন বাবার বাড়ির সম্পত্তি না আনাই ভালো। কেননা বিবাহের সময়ে যে যৌতুক দেওয়া হয় তা সম্পত্তির তুলনায় কোন অংশেই কম নয়। অন্যদিকে, ৪৮% মনে করেন পৈত্রিক সম্পত্তিতে ভাই-বোনের অধিকার সমান হওয়া উচিত। ৮০% সধবা মনে করেন স্বামীর মৃত্যুর পর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। ২০% সধবা এই বিষয়ের জটিলতা ও পারিবারিক অশান্তির কারণে মতামত প্রদান থেকে বিরত থাকেন। হিন্দু বিবাহে যৌতুক প্রথাকে ৫১% সমর্থন করেন না এবং ৪৯% সমর্থন করেন। যারা সমর্থন করেন তাদের যুক্তি হচ্ছে, যেহেতু মেয়েরা বিয়ের পর বাবার বাড়ি থেকে একেবারেই চলে যায় সেহেতু তাদের সম্পত্তির পরিবর্তে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গ্রহণ করাই ঠিক। হিন্দু বিবাহে রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ৩১% ইতিবাচক, ৫০% নেতিবাচক এবং ১৯% মন্তব্য থেকে বিরত থাকেন। যারা রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে নেতিবাচক মতামত দেন তারা মূলত এর আইনগত দিক সম্পর্কে

Dhaka University Institutional Repository

তেমনভাবে সচেতন নয়। এক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের নারী-পুরুষের বিবাহ বিচ্ছেদের আনুপাতিক হার সম্পর্কে অনেকে অলোকপাত করেন।

নিম্নে উত্তরাধিকার বঞ্চিত হিন্দু সধবাদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান বিস্তারিত তুলে ধরা হলো:

১. স্বামীর পরিবারে উত্তরাধিকারহীন হিন্দু বধুর মর্যাদা নির্ভর করে যৌতুকের উপর

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বামীর সংসারে স্ত্রীর মর্যাদা যৌতুকের উপর নির্ভর করে। তবে যৌথ পরিবারের তুলনায় একক পরিবারের স্ত্রীদের উপর স্বামী ব্যতিত পরিবারের অন্যান্যদের প্রভাব অনেকটা কম। মনা (৪০), সোনা (৩৬), প্রিয়া (৩০) তিন জনই ঘোষ বাড়ির বৌ। মনা বড়, তার বাবা ওয়ার্ড কমিশনার, বিয়ের সময়ে মেয়েকে তিনি দিয়েছেন ১০ ভরি স্বর্ণ এবং নগদ ৩ লক্ষ টাকা এবং সংসারের যাবতীয় জিনিসপত্র। সোনা মেঝ, তার বাবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বিবাহের সময়ে তিনি মেয়েকে ৫ লক্ষ টাকা এবং ২টি গরুসহ সংসারের যাবতীয় জিনিসপত্র দিয়েছেন । প্রিয়া সকলের ছোট । তার বাবা বড় ব্যবসায়ী, বিবাহের সময়ে মেয়েকে তিনি ৫ লক্ষ টাকা, ৮ ভরি স্বর্ণ এবং সংসারের যাবতীয় জিনিষপত্র দিয়েছেন । যৌথ পরিবারের বৌ হলেও এই তিন জনের পারিবারিক মর্যাদা তিন রকম। মনা এবং প্রিয়া সংসারের কাজ কিছুটা কম করলেও তাদের কোন তিরস্কার সহ্য করতে হয়না। কিন্তু সোনা সংসারের কাজ একটু কম করলেই তাকে নানা রকম খোটা দেওয়া হয়। কাপড় চোপড়ের বেলায়ও মনা ও প্রিয়াকে যেসব কাপড় দেওয়া হয় সোনাকে তার তুলনায় কম দামী এবং খারাপ কাপড় দেওয়া হয়। মনার বাবার বাড়ির লোকজনের আপ্যায়নের ক্ষেত্রেও মনা ও প্রিয়া বাবার বাড়ির লোকজনের তুলনায় কম মূল্য দেওয়া হয় এবং তাদেরকে চোখে চোখে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাকে বাড়ির বাইরে যেতে হলে শ্বাশুড়ির কাছে যথাযথ কারণ দর্শাতে হয়। বাপের বাড়িতে যাবার ক্ষেত্রেও মনা ও প্রিয়া বছরে দুই তিন বার গেলেও তাকে বছরে মাত্র একার যাবার অনুমতি দেওয়া হয়। সংসারের মতামত নেওয়ার ক্ষেত্রেও সোনার মতামত কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি কখনো যদি সোনা কোন মতামত দিয়েও থাকেন তাকে বেশী কটূক্তি শুনতে হয়। বাড়িতে গাড়ির ব্যবস্থা আছে। মনা এবং প্রিয়াকে এই গাড়িতে যাতায়াতের অনুমতি আছে। অনুমতি নেই সোনার। তাকে ভাড়া করা গাড়ি ব্যবহার করতে হয়।

সারণী ৮: যৌতুক প্রথা সম্পর্কে সধবাদের মতামত

ক্রমিক	মতামত	জন
১	সমর্থন করেন	৫০
২	সমর্থন করেন না	৫০
৩	মোট	১০০

সূত্র: মাঠ পরিদর্শন

২. কন্যা সন্তান জন্ম দিলে হিন্দু বধুকে তিরস্কৃত হতে হয়

মনুসংহিতার পৃষ্ঠা ৩৯১ নবম অধ্যায়ের ৮১ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, "স্ত্রী বন্ধ্যা হলে আদ্য ঋতু থেকে অষ্টমবর্ষে, মৃতবৎস হলে দশম বৎসরে, কেবলমাত্র কন্যা প্রসবিনী হলে একাদশ বৎসরে দ্বিতীয়বার বিবাহ করবে।"

Dhaka University Institutional Repository

একবিংশ শতকের প্রথম ভাগে এসেও হিন্দু নারীকে কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার অপরাধে শাস্তি পেতে হয়। যেখানে বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্বীকৃত না হলেও ধর্মীয়ভাবে বলা হয়ে থাকে কন্যা সন্তান কেবলমাত্র স্ত্রীর দোষেই হয় । সামাজিকভাবেও স্বীকৃত যে যদি কোন স্ত্রীর পুত্র সন্তান না জন্মে তবে বংশ রক্ষার জন্য স্বামী আবার বিবাহ করবে। পারুলের বিবাহের পর প্রথম কণ্যা সন্তান জন্ম দেবার কারণে অনেক শারীরিক মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। দ্বিতীয়বার পারুল যখন আবার সন্তান গর্ভেধারন করলেন তখন তার শ্বাশুড়ি পারুলের স্বামীর জন্য মেয়ে দেখা শুরু করল, পারুলের আবার মেয়ে হবে এই ধারণা হতে; এমনকি পারুলকে তার শ্বশুড় শ্বাশুড়ি মেরে ফেলার ষড়যন্ত্রও করেছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পারুলের পুত্র হল। পুত্রের জন্মের পর পারুলের সংসার আবার জোড়া লাগলো । লক্ষ্মী ৬ বার কন্যা সন্তান জন্ম দেবার পরও যখন পুত্র সন্তান জন্ম দিতে পারল না তখন বাধ্য হয়েই স্বামীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দিতে হলো । কামনার স্বামীর সংসারে ঠাঁই হলো না ৩ কন্যা জন্ম দেবার অপরাধে। তবে উচ্চবিত্ত এবং শিক্ষিত শ্রেণীর একক পরিবারগুলোতে এর কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা গেছে।

৩. বিবাহ রেজিস্ট্রেশন নেই তাই ডিভোর্সেরও কোন সুযোগ নেই

হিন্দু ধর্ম মতে বিবাহ অবিচ্ছেদ্য এবং গবেষণায় দেখা গেছে হিন্দু বিবাহে রেজিস্ট্রেশন নেই । এর ফলে পুরুষ ইচ্ছামতো স্ত্রীকে অস্বীকার করতে পারে এবং ত্যাগ করতে পারে। নারী কোন অবস্থাই প্রমাণ করতে পারে না যে, ঐ ব্যাক্তির স্ত্রী এই নারী। কোন সময়ে আইনী সহযোগিতার প্রয়োজন পড়লে বিবাহের রেজিষ্ট্রেশনের অভাবে আইনী সহযোগিতা লাভ সম্ভব হয়না। রেজিস্ট্রেশনের অভাবে স্বামী দ্বারা নির্যাতিত বা স্বামী দুশ্চরিত্র হলেও নারীর আইনগতভাবে ডিভোর্স করার উপায় নেই। মতামত জরিপে ৩১% মনে করেন হিন্দু বিবাহে রেজিস্ট্রেশন দরকার আছে, ৫০% মনে করেন দরকার নেই, ১৩% জানিনা বলে জবাব দেন এবং ৫% এই বিষয়ে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন।

হিন্দু সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদী নারীদেরকে ভালো চোখে দেখা হয়না। তার উপর ধর্মীয় ভাবে স্বীকৃত যে, হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ নেই। স্বামী ইচ্ছে করলেই বিবাহ করতে পারে। কিন্তু মহিলারা তা পারেন না। নারীদের দ্বিতীয় বিবাহ অর্থই হল ঐ নারী দুশ্চরিত্র। দুশ্চরিত্র অপবাদ নেওয়ার ভয়ে নারীরা বিবাহ বিচ্ছেদে সাহস পায়না। বিবাহিত জীবনের নির্যাতনের একমাত্র পরিত্রাণ মৃত্যু।

সারণী ৯: নারীর অধিকার রক্ষায় বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন দরকার

ক্রমিক	মতামত	জন
১	দরকার আছে	৩১
২	দরকার নেই	৫০
৩	জানিনা	১৩
৪	মন্তব্য নেই	৫
	মোট	১০০

সুত্রঃ মাঠ পরিদর্শন

শিখা, বয়স ২৯, দুই ছেলের মা। বাবা ব্যবসায়ী, তিন ভাইয়ের একমাত্র ছোট বোন। সবার আদরের। যখন ৭ম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়, তখন তাদের বাড়ির পাশে এক এন. জি.ওর উচ্চ পদে নিয়োগ পেয়ে এক ভদ্রলোক আসেন। শিখাকে দেখে ঐ ভদ্রলোক বিবাহের প্রস্তাব দেন। মেয়ে কেবল অস্টম শ্রেণীতে পড়ে এবং মেয়ের তুলনায় ছেলের বয়স বেশী তাই এই সময়ে বাবা মায়ের ইচ্ছে নয় মেয়েকে বিবাহ দেওয়া। কিন্তু ঐ ভদ্রলোক ৩২ বার

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। যখন শিখা স্কুলে যেতো সে(ভদ্রলোক)শিখাকে খুব বিরক্ত করতো । এবাবেই কেটে গেলো এক বছর । শিখা অস্টম শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষা দেওয়ার সাথে সাথেই ঐ ভদ্রলোক শিখাকে আরও পড়াশুনার শর্তে শিখার ঠাকুরমাকে দিয়ে শিখার বাবা মায়ের সাথে কথা বলে ঐ ছেলের সাথেই শিখার বিবাহের কথাবার্তা ঠিক করে। শিখার বিবাহ হয়। বিবাহের পর স্বামীর সাথে শিখা তার কর্মস্থলে চলে যান। পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। বিবাহের এক বছর পরই শিখা গর্ভবতী হয় এবং শিখার অসুস্থতার সাথে সাথেই শিখার বাবা মা শিখাকে তাদের কাছে সন্তান প্রসবের সময় পর্যন্ত রাখেন। শিখার অনুপস্থিতিতে শিখার স্বামী তার কলিগ মহিলার সাথে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। ছেলে সন্তান জন্ম নেওয়ার পর শিখা আবার স্বামীর সংসারে আসে। বাবা মা শিখার সাথে একজন কাজের মেয়েও দেন। প্রতিদিন রাত করে বাড়িতে আসেন শিখার স্বামী। একদিন রাগ করে শিখা তার কাজের মেয়ের কাছে ছেলেকে রেখে সন্ধ্যায় স্বামীর অফিসে আসেন। অফিসে এসে স্বামীকে না পেয়ে বাসায় আসেন। অনেক রাতে স্বামী ফিরলে তার দেরীর কারণ জিজ্ঞেস করলে অফিসের কথা বলেন তিনি। তখন শিখা অফিসে তার না থাকার কথা বললেই শুরু হয় তার উপর নির্যাতন। রাগ করে বাবার বাড়িতে আসেন। শিখার ছেলের কথা চিন্তা করে শিখার বাবা মা তাকে আবার স্বামীর ঘরে ফেরৎ পাঠান। এবার শিখার জীবনে আরও নির্যাতন নেমে আসে। বাধ্য হয়েই শিখা স্বামীর অফিসের অন্যদের কাছে সাহায্য চান। ঘটনাটি জানাজানি হলে চাকুরী চলে যায় শিখার স্বামীর। অন্য এন.জি. ও তে যোগ দেন তিনি। নতুন অফিসে মনের মতো কাউকে না পাওয়ায় শিখার স্বামীর নজর পড়ে বাসার কাজের মেয়র উপর। কাজের মেয়েকে তিনি তাদের আত্মীয়র বাসায় নেবার নাম করে অন্য এক বাসায় নিয়ে যান এবং সেখানে তাকে ভোগ করেন। কাজের মেয়েকে কিছু টাকা দিয়ে। টাকা পেয়ে ঐ মেয়ে শিখাকে কিছু বলে না। এভাবে মাঝে মাঝেই তারা মিলিত হতো নানা অজুহাতে। ঘটনাটি একদিন শিখা টেরও পেল। আবার নির্যাতন শুরু হলো শিখার জীবনে। কাজের মেয়েকে বিদায় করে দেওয়া হলো। তার পরও শিখাকে স্বামীর সংসার করতে হচ্ছে কেননা শিখার বাবা মার কাছে এমন কি সমাজের কারো কাছেই শিখা স্বামীর এই অত্যাচার, দুশ্চরিত্রতার কথা কাউকেই বলতে পারেননি, সন্তান, স্বামীর সম্মানের কথা ভেবে । ইতো মধ্যে শিখা আর এক ছেলের মাও হলো । সন্তানদের সামনে শিখার স্বামী শিখাকে অশিক্ষিত বলে প্রতিনিয়ত অপমান করে। এমনকি শারীরিক নির্যাতনও করে। হিন্দু মেয়েদের বিবাহ বিচ্ছেদ নেই এবং বাবা-ভাই, স্বামী সর্বোপরি পারিবারিক মর্যাদার কথা বিবেচনা করে শিখাকে তার স্বামী সাথে বাধ্য হয়েই থাকতে হচ্ছে।

মনিযার স্বামী সরকারী কর্মকর্তা, মনিষা নিজেও একটি কলেজের একজন শিক্ষক, তারপরও কন্যা সন্তান এবং চাকুরী সংসার, সন্তানদের যত্ন, স্বামীর পরিবারের সকলের যত্ন এবং স্বামীর নিজের যত্নে কোন ত্রুটি হলেই মনিষার ভাগ্যে জোটে শারীরক নির্যাতন। মনিষা এর কোন প্রতিবাদ করতে পারে না । এমন কি চিৎকার করে কাঁদতেও পারেনা। তাতে প্রতিবেশীরা টের পেয়ে যাবে এই ভয়ে। কেননা সমাজে তার স্বামীর পরিবারের তো বটেই সেই সাথে ব্যাক্তিগতভাবে তার নিজেরও একটা সম্মান রয়েছে। এই সম্মান ক্ষুন্ন হবার ভয়ে তাকে সবই ভাগ্য লিপি বলেই উড়িয়ে দিতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

লিপির ১৫ বছরের সংসারে আর একটা মহূর্তও বেচেঁ থাকতে ইচ্ছে করেনা। কেননা বিএ পাশ হলেও লিপি দেখতে কিছুটা কালো এবং খাটো । তার স্বামী দেড় লক্ষ টাকা যৌতুক নিয়ে বিয়ে করেছে। যৌতুকের টাকা যতদিন ছিল ততদিন স্বামীর সংসারে লিপির আদর যত্নও ছিলো । কিন্তু সে বেশীদিন রইলনা । কালো এবং খাটো হয়ে জন্ম নেবার অপরাধে বাবা মা সহ সবাইকে নিয়ে লিপির প্রতিদিন গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। লিপির দিন শুরু হয় কালি বলেই। লিপি নাম হলেও গায়ের রং কালো হওয়ায় স্বামীর সংসারে তাকে কালি বলেই ডাকা হয়। কালি নামের অন্তরালে হারিয়ে গেছে তার লিপি নাম। হিন্দু বিবাহে বিচ্ছেদের অনুমতি থাকলে লিপি অবশ্যই এই গঞ্জনা হতে মুক্তির উপায়ে চিন্তা করতো। লিপির মতে, 'আমাদের দেশে হিন্দু হয়ে জন্ম নেয়া এমনিতেই অপরাধ, তার উপর মেয়ে জন্ম নেওয়া মানে পাপ।"

৪.স্বামী ইচ্ছে করলে একাধিক বিবাহ করতে পারে এতে স্ত্রীর কোন মতামতের সুযোগ থাকেনা

মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের পৃষ্ঠা ৩৯১, ৮২ নং শ্লোকে বলা হয়েছে "স্ত্রী রুগ্না হয়েও যদি পতিব্রতা এবং শীলাবতী হয় তবে স্বামী তার অনুমতি নেবার পর দ্বিতীয় বার বিবাহ করবে। এই অধ্যায়ের ৮০ শ্লোকে বলা হয়েছে স্ত্রী যদি মদ্যাপানাসক্তা বা ভর্তার প্রতিকূল আচরণশীলা হয়, যদি সে দুষ্টু ব্যাধিযুক্তা হয়, হিংসা এবং স্বামীর অধিক ধনক্ষয়কারিনী হয় তবে সে থাকা সত্বেও স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করবে।" মনুর এই উক্তি ধর্মীয়ভাবে হিন্দু পুরুষের জন্য স্বীকৃত। তাই হিন্দু নারীর ইচ্ছা অনিচ্ছা বা মতামতের কোন সুযোগই থাকেনা পুরুষের পুর্নবিবাহে। বহু বিবাহ প্রসঙ্গে একজন পুরুষের বক্তব্য, "মাইয়া মনুষ আবার মানুষ নাকি, ওরা তো মাইয়া, অগো আবার অনুমতি কি?" কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়া, যৌতুকের পরিমাণ কম হওয়া, সংসারে সন্তান না আসাসহ যে কোন অজুহাতেই স্বামী পুণরায় বিবাহ করতে পারে।

৫. সমাজে স্বামী পরিত্যাক্তা নারীর অবস্থা বেশি নাজুক

বিবাহ বিচ্ছেদের বিধান না থাকার কারণে স্বামী পরিত্যাক্তা নারী আইনী প্রক্রিয়ায় তার অধিকার আদায় করতে ব্যর্থ হয়। স্ত্রীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্বামী একাধিক বিয়ে করলেও স্ত্রীকে শাঁখা-সিঁদুর পরতে দেখা যায়। দেশের প্রচলিত আইন মোতাবেক পরিত্যাক্তা স্ত্রীকে খোরপোশ দেওয়ার কথা থাকলেও হিন্দু নারীর ক্ষেত্রে তা আদায় করা সম্ভব হয় না। বিবাহিত পুরুষের একাধিক বিয়ে হিন্দু সমাজে তেমন খারাপ চোখে দেখা হয় না। সাধারণ ভাবে মনে করা হয়, নিশ্চয়ই মেয়েটির কোন সমস্যা নইলে ওর স্বামী আবার বিয়ে করবে কেন। পুরুষের ক্ষেত্রে একাধিক বিয়ে যত সহজ নারীর ক্ষত্রে ঠিক ততটাই কঠিন। হিন্দু সমাজে স্বামী পরিত্যাক্তা মেয়েকে ঘরের বউ করে আনার নজির খুবই কম। বিয়ের এক যুগের মাথায় যখন তাদের দুই ছেলে মেয়ে ঘরে, রূপমালার স্বামী একদিন তার অনুমতি ছাড়াই এক মেয়েকে বউ করে ঘরে আনেন। সুখের সংসারে এই অশান্তি তার সয়নি। ছুটে যান থানায়। থানা মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানালে নিরক্ষর এই গৃহবধূ মায়ের সহায়তায় মানবাধিকার সংস্থার দ্বারস্থ হন। মিমাংসা আটকে যায় দীর্ঘসূত্রীতায়। এরই মধ্যে পারিবারিক আপোস রফা হয় যে, সে স্বামীর সংসারে সতীনের সঙ্গে ঘর করবে। অসহায় রূপমালা মেনে নেয়। কিছুদিন পর স্বামী তৃতীয় বউ ঘরে তোলেন। আবার বিতারিত হন রূপমালা। সামাজিক বিচার প্রক্রিয়ায় সুফল না পেয়ে আবার মানবাধিকার সংস্থায়। শুধু

Dhaka University Institutional Repository

তাই নয় স্বামী সন্তান ফিরে পাবার জন্য ওঝা-কবিরাজের দ্বারস্থ হন। কিন্তু কোন কিছুতেই কিছু হয় না। মনের জ্বালার সঙ্গে ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ট এই নারী এখন অন্যের বাসায় ঝি চাকরের কাজ করেন। এখন তার একমাত্র আস্থা ঈশ্বরে।

৭. বর্ণ প্রথার কু প্রভাব

হিন্দু সমাজে বর্ণ প্রথার কুপ্রভাব অনেক। নিম্ন বর্ণের মেয়ে উচ্চ বর্ণের মধ্যে বিবাহ হলে সে মেয়ের জীবনে না না গঞ্জনা সহ্য করতে হয় । রেখা মধূ নিম্ন বর্ণেও মেয়ে আর শ্যামল চক্রবর্তী উচ্চ বর্ণের । দুজনেই ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় হতে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েছেন। দুজনে দুজনকে ভালোবাসেন। শ্যামল চাকুরী পেয়ে তার বাড়িতে রেখাকে বিবাহের কথা বললেন। শ্যামলের পরিবার রেখাকে বিবাহ না করার জন্য বলল। কিন্তু উচ্চ শিক্ষিত শ্যামল রেখাকে ব্যতীত অন্য কাউকেই বিবাহ না করার সিদ্ধান্তে অটল। শ্যামলের সিদ্ধান্ত জানানোর পর তার পরিবার রেখার পরিবারকে রেখাকে অন্য জায়গায় বিবাহ দেবার জন্য চাপ প্রয়োগ করল। রেখার পরিবার বাধ্য হয়েই কন্যার কল্যাণে অন্য জায়গায় পাত্র দেখা শুরু করে। প্রসঙ্গে ক্রমে বলা বাহুল্য রেখার কোন ভাই নেই । তারা কেবলমাত্র দুই বোন। বাবা ও বেশ সম্পদশালী নয়। এই ঘটনা টের পেয়ে পরিবারের মতের বিরুদ্ধে শ্যামল রেখাকে বিবাহ করে। শ্যামলের পরিবার রেখা শ্যামলকে পরিত্যাগ করে। শুধু তাই নয় রেখার বাবাকেও নানা রকম ভয় ভীতি দেখিয়ে রেখাকে শ্যামলের কাছ থেকে সরানোর চেষ্টা করে। বর্তমানে রেখা এবং শ্যামল দুজনেই পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন।

সারণী ১০: সধবাদের বর্তমান বয়স

ক্রমিক	বয়স	জন
১	২০-২৫	২৫
২	২৬-৩৫	৪৫
৩	৩৬-৪৫	২২
৪	৪৬-৫৫	৮
৫	মোট	১০০

সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন

অন্য দিকে নারায়ন হালদার, সরকারী কলেজের প্রফেসর। বর্তমানে তার বয়স ৫৮। নারায়ন বাবু তার গ্রামের শ্রেষ্ঠ ছেলে সব কিছুতেই। নারায়ন নিম্ন বর্নের, তার জন্য উপযুক্ত কোন কন্যা বিবাহের জন্য পাওয়া না গেলে উচ্চ বর্ণের কন্যার সাথে তার বিবাহ হল। বিবাহের পরে নারায়নের বধু নরায়ন বাবুর পরিবারের সাথে থাকতে অস্বীকৃতি জানান্। নারায়ন বাবুর শ্বশুর মহাশয় নারায়ন বাবুকে সরকারী কলেজের চাকুরী ছাড়িয়ে দিয়ে মেয়ে সহ বিদেশে পাঠান । বিদেশের মাটিতে থেকে নারায়ন বাবুর আর তার মায়ের সাথে তথা তার পরিবাবর হতে বিছিন্ন হয়ে এক পাক্ষিকভাবে সন্তান এবং বধুর আত্মীয় পরিজনের কাছে উন্নত "ঘরজামাই" হিসেবে বাস করছেন।

৮. সন্তানদের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে স্বামীর সিদ্ধান্তই মেনে নিতে হয়

জয়া নিজে একজন ডাক্তার । জয়ার একমাত্র সন্তান ছেলে। সন্তান গর্ভে ধারন করে ভেবেছেন এই সন্তানকে মনের মতো করেই বড় করে তুলবেন। কিন্তু স্বামীর খুব ইচ্ছে ছিল কন্যা সন্তান হোক। ছেলে হবার পরও ছেলেকে মেয়ের মতো করে সাজাতো তার স্বামী। যেহেতু জয়া নিজে ডাক্তার সেহেতু তিনি মনে করতেন, বয়স বাড়ার সাথে সাথে স্বামীর পরিবর্তন

Dhaka University Institutional Repository

হবে। কিন্তু জয়ার স্বামী ছেলের বয়স বাড়ার সাথে সাথে মেয়েলী পোষাক ছাড়ালেন ঠিকই কিন্তু ছেলে কি খাবে ছেলে কি করবে তা সবই তার সিদ্ধান্তে অটল। ছেলের কোন ব্যাপরে জয়ার মতামত গ্রহন যোগ্য নয়। স্বামী যা বলেন তাই তাকে মেনে নিতে হয়। নাহলে অশান্তি শুরু হয়। স্বামী গায়ে হাত তোলেনা ঠিকই কিন্তু দেখা যায় ছেলেকে নিয়ে সে অন্য বাসায় চলে যায়, দুদিন তিন দিনেও কোন খোঁজ থাকেনা। তাই বাধ্য হয়েই ছেলের কল্যানে স্বামীর কথাই মেনে নিতে হয়। এরকই হল দেবী, অরুনা, উমা, শিখা, অলপনা এদের অবস্থা।

৯. হিন্দু নারী ধর্মীয় বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ

মাঠ গবেষণায় দেখা গেছে যে হিন্দু নারীদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু আইন সম্পর্কে সচেতন নয়। পারিবারে কর্তা যে পারিবারিক আইনের কথা বলে থাকেন গৃহলক্ষী হিসেবে তাকে সেই আইন মেনে চলতে হয়। তাছাড়া সংসারের সবগুলো মানুষের সুখি করার কৌশলগুলো মনে রাখতে গিয়ে, নিজের আর সময় হয়ে ওঠে না আইন সম্পর্কে জানবার। আর যদি কোন নারী হিন্দু আইন সম্পর্কে কিছুটা জেনে থাকে তখন বাড়ির পুরুষের বক্তব্য হয়, "ঘরের মেয়ে ঘরের কাজেই মানায় তার এত বেশী জানার দরকার নেই।" অঞ্চলভেদে নারীর উপর কর্তৃত্ব করতে পুরুষ ধর্মীয় বিধানের অজুহাতে বিভিন্ন পারিবারিক আইন তৈরী করে। কখনো মনগড়া এই আইনের অবাধ্যতা করলেই হিন্দু আইনের লঙ্ঘন করার জন্য শাস্তি পেতে হয়। তাই বাস্তবতা, ধর্মীয় মূল আইন সম্পর্কে হিন্দু নারীর জানবার আগ্রহও কম। কেননা নিয়মের মধ্যে থেকে নিয়ম ভঙ্গের স্পর্ধা দেখানোর মতো সাহস এই দেশের হিন্দু নারীদের মধ্যে নেই।

১০. হিন্দু নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি অবহেলিত

সারণী ১১: হিন্দু নারীর ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক ভাবে নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য যা দরকার

ক্রমিক	মতামত	জন
১	শিক্ষা	৩৬
২	চাকুরী	৫৭
৩	সম্পদ	২
৪	অন্যকিছু /ব্যবসা	৪
	মোট	১০০

হিন্দু নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য যে সকল বিষয় নিশ্চিত করা দরকার বলে তারা মনে করেন তা হচ্ছে শিক্ষা, চাকুরী, সম্পদ, ব্যবসা অন্য কোন কিছু। তথ্যদাতাদের ৩৬% মনে করেন শিক্ষাই হল নারীর মর্যাদা রক্ষার প্রথম শর্ত, কেননা শিক্ষাই নারীকে আত্ম নির্ভরশীল করে তোলে। ৫৭% মনে করেন চাকুরী হলেই নারীর মর্যাদা রক্ষা হয়। ২% মনে করে সম্পদ হলেই নারীর মর্যাদা রক্ষা পায়। ৪% মনে করেন ব্যবসা বা অন্য কিছু নারীর মর্যাদা রক্ষা করতে পারে । উপরোক্ত তথ্য হতে এ কথাই স্পষ্ট হয় যে, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য এবং নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য শিক্ষা ও অর্থের প্রয়োজন। আর এই অর্থের উৎস যাই হোক না কেন।

Dhaka University Institutional Repository

সার সংক্ষেপঃ

উপরোক্ত তথ্যে দেখা যায় বাংলাদেশের সকল হিন্দু নারীই পারিবারিক আইন, প্রথা ও সামাজিক রীতি-নীতির কারণে বৈষম্যের স্বীকার। উত্তরাধিকার সম্পত্তি না পাওয়া, বিবাহে যৌতুক দেওয়া, কন্যা হিসেবে ভাইয়ের সমান অধিকার না পাওয়া, বর্ণ প্রথা, বাল্য বিবাহ, আইনগত সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সকল নারীর অবস্থানই প্রায় এক রকম। তবে সধবা-বিধবাদের তুলনামূলক অবস্থান বিশ্লেষণে দেখা যায়, যাদের স্বামী বর্তমান তাদের তুলনায় যাদের স্বামী মৃত বা যারা স্বামী পরিত্যাক্তা তাদের সমস্যা প্রকট। দেখা গেছে যে সকল নারী অর্থ-সম্পদের মালিক বা লেখাপড়া আছে তাদের মর্যাদা পরিবার ও সমাজে অনেক বেশি। তবে এদের সংখ্যা খুবই সীমিত।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৬

বাংলাদেশে হিন্দু নারীর ক্ষমতায়ন : বিশেষজ্ঞ মতামত

নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন,

"তার (নারীর) বুদ্ধি, তার সংস্কার, তার আচরণ, নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার দ্বারা বহু যুগ থেকেই প্রভাবান্বিত।
তার শিক্ষা তার বিশ্বাস বাহিরের বৃহৎ অভিজ্ঞতার সত্যতা লাভ করার সুযোগ পায়নি।
. .. . চিত্তের বন্দিশালা এমনি করে দেশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে, এবং প্রতিদিন তার ভিত্তি হয়ে উঠছে দৃঢ়।"

(উলাহ, সা'দ, ২০০২, পৃ.৪৯-৫০)

কবিগুরুর এই উক্তি দক্ষিণ এশিয়ার সকল নারীর ক্ষেত্রে সত্য হলেও বাংলাদেশের হিন্দু নারীর ক্ষেত্রে আরো বেশি সত্য। এ অধ্যায়ে হিন্দু নারীর ক্ষমতায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে ২৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির মতামত নেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ৫ জন আইনজীবি, ৫ জন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ৭ জন শিক্ষাবিদ, ৬জন নারী নেত্রী, ৫ জন ধর্মীয় প্রতিনিধি ও নেতা।

নিম্নে হিন্দু নারীর উত্তরাধিকার ও ক্ষমতায়ন সম্পর্কে এদের মতামত তুলে ধরা হলো:

১. হিন্দু ধর্মীয় নেতা ও প্রতিনিধিদের মতামত:

Dhaka University Institutional Repository

এদের মধ্যে একদল মনে করেন, হিন্দু ধর্মে নারীর মর্যাদা সকল সময়ে উচ্চে রয়েছে। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা হিন্দু নারীকে দেবী হিসেবে দেখেছেন। কন্যা সন্তান যখন জন্ম গ্রহণ করে, তখন পিতা তার সাধ্য অনুযায়ী যোগ্য করে তোলে। যখন পিতা তাকে বিবাহের মাধ্যমে সম্প্রদান করেন তখন তার সামর্থ্য অনুযায়ী কন্যার প্রয়োজনীয় জীবন ধারণের জন্য সব কিছু কন্যার সঙ্গে দিয়ে দেন, যাতে করে পরবর্তী জীবনে তার কোন সমস্যা না হয়। তাই সে যে বাবার উত্তরাধিকারী নয় তা বলা যায় না। তবে এটা সত্য হিন্দু রমনীর সম্পত্তিতে অধিকার থাকলে তার আর্থিক নিশ্চয়তা থাকতো। হিন্দু নারীর বিবাহিত জীবন যেহেতু জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক, সেহেতু বিষয় সম্পত্তিতে অধিকার থাকলে বৈবাহিক জীবনে দন্দ্বের মাত্রা বেড়েও যেতে পারে। মনু সংহিতায় উত্তরাধিকারের যে বিধান রয়েছে তা খুবই ভালো। অন্যান্য ধর্মে পারিবারিক যে আইন রয়েছে তা ব্যক্তি জীবনে অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বর্তমান বিশ্বে মাত্রাতিরিক্ত অশান্তির সৃষ্টি করেছে, যে কারণে তারা আবার নতুন করে সনাতন ধর্মের মতো আইন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। যেহেতু বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বাটোয়ারা আইনে অভিন্ন পারিবারিক আইন পাস করেছে; সেহেতু আর নতুন করে হিন্দুদের জন্য উত্তরাধিকার আইনের প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে বাস্তবতা বিচারে যদিও এদেশের হিন্দু বিধবাদের আর্থ সামাজিক অবস্থান অত্যন্ত নিম্নে এবং তারা অমানবিক জীবন যাপন করছে, তথাপি হিন্দু মাইথলজি অনুসারে হিন্দুদের জীবনযাত্রা যেহেতু বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ধর্মীয় আইন দ্বারা স্বীকৃত; সেহেতু বাংলাদেশের মতো একটি অনুন্নত দেশে দ্বন্দ্ব তৈরীর জন্য হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের পরিবর্তনের কোনই প্রয়োজন নেই। যেহেতু হিন্দুরা ঈশ্বর সৃষ্ট আইনে বিশ্বাসী সেহেতু হিন্দু আইনের পরিবর্তনের মতো ধৃষ্টতা সৃষ্টিকর্তা ব্যতিরেকে আর কারও নেই। তবে তাঁরা বাংলাদেশে হিন্দু পারিবারিক আইনের সংশোধনের ঘোরতর বিরোধী। তাঁদের ভাষায়, বাংলাদেশের বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এ ধরণের একটি শুভ উদ্যোগের অনুকূলে নয়। তাঁরা বলেন, এই আইন সংশোধন করা হলে সমস্যার ভারে জর্জরিত হিন্দুদের সমস্যা মালায় আরো একটি সমস্যা যোগ হবে। তাদের নাজুকতা আরো বাড়বে। হিন্দু নারীদের সম্পত্তির অধিকারী করা হলে ধর্মান্তরের ঘটনা বেড়ে যাবে। তখন সম্পত্তির লোভে প্রেমের ফাঁদে ফেলে হিন্দু মেয়েদের ধর্মান্তরিত করা হবে, নতুবা জোড় পূর্বক তাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হবে। যা হবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য দুঃসহ যন্ত্রণার কারণ। তাছাড়া অনেকের ধারণা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হিন্দু সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হবার একটা আশংকা থেকেই যায়।

এই মতের বিরোধিতা করে আরেকদল নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করতে হিন্দু পারিবারিক আইনের সংশোধন করার পক্ষে মত দেন।

২. আইনজীবিদের মতামত:

আইনজীবিদের মধ্যেও আনেকে মনে করেন হিন্দু আইনের পরিবর্তন দরকার, অনেকে মনে করেন দরকার নেই। পক্ষাবলম্বনকারীদের মতে, চলমান বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে হলে হিন্দু পারিবারিক আইনকে অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। তবে এজন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে সর্বাগ্রে। তারা মনে করেন আইন সভায় যে কেউই হিন্দু আইনের পরিবর্তনে বিল তুললে খুব সহজেই এই আইন পাশ হবে এবং হিন্দু ধর্মের লোকজন তা মেনে নেবে। যারা বিপক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছেন তারা মনে করেন বাটোয়ারা আইন সকল ধর্মের নারী পুরুষের জন্য প্রযোজ্য। তাই নতুন করে আইনী জটিলতা তৈরীর জন্য হিন্দু আইনের পরিবর্তন নেই বলে তারা আভিমত দেন।

৩. রাজনীতিকদের মতামত:

হিন্দু নারীর উত্তরাধিকারের ধারা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে পরিবর্তন হলেও বাংলাদেশে পরিবর্তন হয় নাই। সরকার একে একটি সংখ্যালঘু ইস্যু হিসেবে সব সময় পাশ কাটিয়ে গেছে। পৈত্রিক সম্পত্তিতে নারীর অবস্থান স্বীকৃত হলে নারীর প্রতি বৈষম্য, সমঅধিকার এবং নারীর নিরাপত্তার মাত্রা বাড়বে। বর্তমান বিশ্বে সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে হিন্দু পারিবারিক আইনের পরিবর্তন আবশ্যক। এ নিয়ে সরকারের ভাবা উচিত। তবে যেহেতু এটি একটি স্পর্শকাতর বিষয় তাই এ বিষয়ে যে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে সরকারের উচিত হবে হিন্দু ধর্মীয় নেতৃ-বৃন্দের সহায়তা নেওয়া।

৪. সুশীল সমাজের অভিমত:

মানুষের জন্য আইন; আইনের জন্য মানুষ নয়। হিন্দু ধর্মীয় রীতি-নীতি সব যুগেই পরিবর্তীত হয়েছে। জীবন বহতা নদীর মতো। স্রোতোধারা রুদ্ধ হয়ে গেলে নদী যেমন থেমে যায়, একই ভাবে জীবন সত্যকে অস্বীকার করলে জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। যুগ সত্য এবং জীবন সত্যকে স্বীকার করে হিন্দু আইনের পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং সংশোধন প্রয়োজন বলে কেউ কেউ মনে করেন। আবার অনেকে আইন পরিবর্তনের দরকার নেই বলে মনে করেন। তাদের মতে, আইনের চেয়ে মানুষের মনের পরিবর্তন জরুরী বলে মনে করেন। মন যদি ভাল হয়, তবে আইন কোন বাধা হতে পারে না। মন ভালো করার জন্য প্রয়োজন কিছু আইনী শক্তি, যা মানসিক বল বাড়াবে। আবার অনেকে মনে করেন, গতানুগতিক আইনকে চালু না করে কিভাবে অবিবাহিত কন্যা, বিধবা এদের আর্থিক নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা দেয়া যায়, এ ব্যাপারে একটা নতুন পথ খোঁজার চেষ্টা করা। এ ক্ষেত্রে আইনজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতিবিদ, সর্বোপরি শহর ও গ্রামের অভিজ্ঞ ও প্রবীণদের সাথে কথা বলে আইন তৈরী করতে হবে।

৫. নারী নেত্রীদের মতামত:

নারী নেত্রীরা মনে করেন বর্তমানে সকল ধর্মের নারীর জন্য সমান আইন তৈরী করা দরকার। প্রত্যেক ধর্মের অনুশাসনে নারীরা যুগে যুগে নির্যাতীত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। এখন সময় এসেছে নারী আধিকার রক্ষার্থে সকলকে একত্রিত হবার। তারা সকলেই বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা পরিষদ কর্তৃক প্রবর্তিত ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোডকে আইনগত স্বীকৃতি দেবার জন্য সকল ধর্মের নারীদের একত্রে লড়াই করার আহবান জানান। এই কোড প্রবর্তনের জন্য জনমত যাচাইয়ের প্রয়োজন। জনমত যাচাইয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করলে বিভিন্ন সংস্থা এবং দেশের বুদ্ধিজীবি, আইনজীবি, ধর্মীয় ব্যাক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিকসহ সর্বস্তরের নর-নারী উভয়েরই প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন। এই প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে একটি কমিটি সামগ্রিক তত্ত্বাবধানের কাজ চালিয়ে যাবেন।

Dhaka University Institutional Repository

সার সংক্ষেপ:

উপরোক্ত মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায়, হিন্দু নারীর উত্তরাধিকার প্রশ্নে বিশেষজ্ঞ বুদ্ধিজীবি, নীতি নির্ধারক ও সমাজপতিদের বেশিরভাগই ইতিবাচক মত দেন। তারা মনে করেন নারীর ক্ষমতায়নের মূল শর্ত সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা। এই জন্য তারা আন্তর্জাতিক সনদ ও দেশীয় নীতির আলোকে হিন্দু পারিবারিক আইনের পরিবর্তন দরকার বলে মত দেন। কেউ কেউ ধর্মান্তরের শঙ্কায় হিন্দু নারীর সম্পত্তির অধিকারের বিরোধিতা করে বলেন এতে হিন্দুদের সামাজিক সমস্যা বাড়বে যা রোধ করার রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক নিশ্চয়তা নেই। হিন্দু ধর্মীয় প্রতিনিধিদের কেউ কেউ বলেন, হিন্দু মেয়েদের 'দেবীর আসনে' রাখা হয়েছে এর পরে আর নতুন কোন অধিকারের দরকার নেই।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৭

উপসংহার ও সুপারিশমালা

বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে নারীর স্থান পুরুষের সমান উল্লেখ থাকলেও বিভিন্ন ধর্মের পারিবারিক আইন নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। সমাজের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধর্মে ভিন্ন ভিন্ন আইন কার্যকর। এসব আইন ও নিয়মের/প্রথার ভিত্তি ধর্ম। বাংলাদেশে হিন্দু পারিবারিক আইন তুলনামূলকভাবে অন্যান্য ধর্মের চেয়েও নারীর সমস্যা বেশী। কেননা সমঅধিকারের প্রশ্নে হিন্দু নারী খুব উপেক্ষিত। আর সমঅধিকারের জন্য অন্যান্য ধর্মের নারীদের স্বপক্ষে যে, আইন কানুন রয়েছে হিন্দু নারীর বেলায় এর ঘাটতি রয়েছে। রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে এই বৈষম্য দূর করার তেমন উদ্যোগ নেই।

হিন্দু আইন হিন্দুদের ধর্মীয় ও পুরুষ শাসিত সমাজের প্রচলিত আইন। এই আইন হিন্দুদের উত্তরাধিকার, বিয়ে, ধর্মীয় বিষয়াদি যেমন-ধর্মীয় বা দাতব্য কারণে সম্পত্তি দান বা দেবোত্তর, দানপত্র, দত্তক গ্রহণ, অভিভাবকত্ব নির্ণয়, ভরণপোষণ ইত্যাদি সংক্রান্ত আইন। হিন্দু নারীর পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে একচ্ছত্র অধিকার নেই, জীবনস্বত্ব আছে। অর্থাৎ, জীবিত অবস্থায় ভোগ করতে পারে, বিক্রি করার অধিকার নেই। পুত্র সন্তানের বর্তমানে হিন্দু নারী কখনোই উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পায় না। The Hindu Women's Rights to Property Act, 1937 অনুযায়ী বিধবা যে সম্পত্তি পায় তাও জীবনস্বত্বে। মৃত স্বামীর দায় বা কল্যাণ ব্যতীত এ সম্পত্তির হস্তান্তও নিষিদ্ধ। মৃত স্বামীর আত্মার মঙ্গলার্থে পিন্ডদানের জন্য বিধবা তার প্রাপ্ত সম্পত্তি বিক্রি করে সে অর্থে তীর্থস্থানে যেতে পারে কিন্তু নিজের সুখের জন্য এ সম্পত্তি বিক্রিও কোন অধিকার বিধবার নেই। স্ত্রীধন অর্থাৎ, যে সম্পত্তিতে হিন্দু নারীর চূড়ান্ত মালিকানার অধিকার বলে হিন্দু নারী স্ত্রীধন ইচ্ছানুসারে ভোগ দখল বা হস্তান্তর করতে পারে, সেই স্ত্রীধন সম্পর্কেও বলা হয়েছে যখনই একজন হিন্দু নারী স্বামীর বর্তমানে কোনো স্ত্রীধনের অধিকারী হবে, তখন স্বামীর অনুমতি ব্যতীত হিন্দু নারী তার স্ত্রীধন দান বা বিক্রি করতে

Dhaka University Institutional Repository

পারবে না। অর্থাৎ স্ত্রীধনের সংজ্ঞায় চূড়ান্ত মালিকানা বা সম্পূর্ণ স্বত্বের কথা বলা হলেও, একজন হিন্দু নারী তার স্ত্রীধন স্বামীর জীবদ্দশায় সীমিত অর্থে ভোগ করতে পারে।

১৯৫৬ সালে ভারতে হিন্দু আইনের ব্যাপক সংস্কার হয়েছে যা হিন্দু নারীর অধিকার ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। ভারতে Hindu Disposition of Property Act, 1956 পাস হওয়ার পর সেখানে বাবার মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি পুত্র-কন্যা সমান অংশ পায়। হিন্দু রাষ্ট্র নেপালেও এ বিষয়ে আইনের সংশোধন হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে কোন সংস্কার হয়নি। সম্প্রতি হিন্দু অইন সংস্কারের জন্য আইন কমিশন উদ্যোগ গ্রহণ করলেও বাস্তবে আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ সিডও-তে বলা হয়েছে যে, নারীর অধিকার মানবাধিকার হিসেবে দেখা হোক। একজন মানুষ হিসেবে পরিবারে, সমাজে রাষ্ট্রে পুরুষের সাথে সমতাওে অধিকার ভোগ করার নিশ্চয়তাই নারীর অধিকার৷ কেননা রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন- সামগ্রিক নারী কল্যাণ ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি। আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশে নারীর অধিকার সংরক্ষণে বাংলাদেশ সংবিধানে এবং জাতীয় পরিকল্পনায়ও নারীর অধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এত কিছুর পর ও বাংলাদেশের হিন্দু নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।

যদিও জাতীয় পরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়নের মূল সূত্র হচ্ছে, নারীর অধিকারকে মানবাধিকার রূপে স্বীকৃতি। এর মাধ্যমে স্বীকার করা হয়েছে যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, মেধা প্রজনন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর অধিকার, বিশেষ কোন সুবিধা নয় বরং মানুষ হিসেব তার মৌলিক অধিকার । জাতীয় পরিকল্পনায় সকল ধর্মের নারীর উত্তরাধিকার, সম্পত্তির অধিকার একই ধরনের হবে এই লক্ষ্যে পরিচালিত হলেও বাস্তবতা এই যে, ধর্মীয় ভাবে হিন্দু এবং মুসলিম নারীর সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকারের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

বাংলাদেশে হিন্দু আইনের সংস্কার না হওয়া হিন্দু নারীর ক্ষমতায়নের পথে প্রধান অন্তরায়। এখানে হিন্দু নারী মাত্রই সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং অর্থনৈতিক অধিকার সীমতি। যদিও সধবা হিন্দু নারীর তুলনায় বিধবারা বেশী নিরাপত্তাহীন। স্বামীর মৃত্যুর পর একজন হিন্দু নারীর জীবনের কোন সাধ আহ্লাদ তো দুরের কথা তাদের জীবিকা নির্বাহও কঠিন হয়ে পড়ে। স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে কেবলমাত্র ঐ বিধবাই নয় তার যদি কন্যা সন্তান এবং প্রতিবন্ধী সন্তান থাকে তাদের জীবনও মায়ের মত সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে। হিন্দু পারিবারিক আইনে বিধবার কেবলমাত্র মৃত স্বামীর সম্পত্তি ভোগসত্বের দাবীদার, তবে ঐ বিধবার মৃত্যুর পর যদি তার পুত্র সন্তান না থাকে তাহলে কন্যা সন্তান (যিনি পুত্রবতী বা যার পুত্র সন্তান রয়েছে) ঐ সম্পত্তির দাবীদার এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী পুত্র সন্তান সম্পত্তির অধিকার হতে বঞ্চিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সধবা বধুর (যাদের স্বামী বর্তমান) ক্ষেত্রে এই নিরাপত্তাহীনতার মাত্রা তুলনামূলকভাবে কম। কেননা, স্বামীর দেওয়া শাখাঁ সিঁদুরের অলঙ্করণে ভুষিত হয়ে থাকার কারণে নিরাপত্তাহীনতার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সমুহের প্রভাব কম থাকে।

নারীর ক্ষমতায়ন একটি সামগ্রিক বিষয়। তাই নারীর ক্ষমতায়নে ধর্মভিত্তিক উত্তরাধিকার ব্যবস্থা না রেখে যুগের ধারাবাহিকতায় সকল নারী -পুরুষের সমানাধিকার প্রদানের মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সুপারিশমালা :

ক. উত্তরাধিকার সংক্রান্ত :

১. উত্তরাধিকার আইনে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
২. বিধবা ও তার কন্যা সন্তানের নিরঙ্কুশ উত্তরাধিকার দিতে হবে।
৩. বিধবাদের ক্ষেত্রে স্বামীর সম্পত্তিতে কেবল ভোগস্বত্ব নয় পুর্ণ অধিকার দিতে হবে ।
৪. স্ত্রী ধনের উপর নারীর পূর্ণমাত্রায় অধিকার থাকবে।
৫. প্রতিবন্ধিদের (শারীরীক ও বুদ্ধিবৃত্তিক) সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হবে।
৬. যদি কোন হিন্দু নারী স্বধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মের অনুসারী হয়ে সংসার ধর্ম পালন করে তবে সে নারী পারিবারিকভাবে পিতৃপুরুষের সম্পত্তির অধিকার হারাবে; অবিবাহিত অবস্থায় তার নিজস্ব উপার্জনের সম্পত্তি তার থাকবে।

খ. বিবাহ সংক্রান্ত:

১. শাস্ত্রীয় বিবাহের পাশাপাশি প্রতিটি বিবাহে নিবন্ধীকরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।
২. অসবর্ন বিবাহ প্রচলন করে হিন্দু নারীর যোগ্যতাকে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।
৩. পুরুষের বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করে, বিধবা বিবাহের সামজিক মনোভাব দুর করতে হবে।
৪. কোন কোন হিন্দু মেয়ে যদি নিজ সম্প্রদায় ছেড়ে অন্য সম্প্রদায় চলে যায় এবং পরিবেশ পরিস্থিতিগত কারনে বা ভুল সংশোধন করতে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে অসতে চায়, তবে তাকে গ্রহণ করার সুযোগ থাকতে হবে।
৫. বিবাহের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের উভয়ের বয়সের বাধ্যবাধকতার প্রচলন এবং বাস্তবায়ন করতে সরকারী উদ্যোগ নিতে হবে।
৬. গণ মাধ্যমগুলোতে হিন্দু নারীর জীবন ধারা সম্মলিত কাহিনী প্রচার করতে হবে।

গ. বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে:

১. নারী পুরুষ উভয়েরই বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার সংরক্ষণ করে সমঅধিকার দেয়ার প্রচলন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. অভিভাবকত্ব :

১. সন্তানদের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ের সমান অধিকার স্বীকৃত থাকবে।

ঙ. নির্ভরশীলদের ভরনপোষণ:

১. ভরণপোষণের প্রশ্নে নির্ভরশীলদের চিহ্নিত করতে স্বামী স্ত্রী উভয়েরই দায়িত্ব থাকবে।

২. নির্ভরশীলদের তালিকায় বিধবা বোন, কন্যা, স্ত্রীর বৃদ্ধ পিতা মাতা, মৃত কন্যার সন্তানাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩. প্রতিবন্ধি (শারীরীক ও বুদ্ধিবৃত্তিক) সন্তানকে পুত্র এবং কন্যাকে স্বাভাবিক সন্তানের মতো ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. প্রতিবন্ধি (শারীরীক ও বুদ্ধিবৃত্তিক) স্ত্রী স্বামীর, স্বামী বাবার উভয়ের ক্ষেত্রেই ভরণ পোষণ সম্পত্তির অধিকার থাকতে হবে।

৫. প্রতিবন্ধী (শারিরীক ও মানসিক) সন্তানকে স্বাভাবিক সন্তানের তুলনায় সম্পত্তির অংশ বেশী থাকা উচিত।

চ. দত্তক গ্রহণ:

১. বিধবা, অনুঢ়া (চিরকুমারী) বা স্বামী সাহায্যবিহীন নারীকে দত্তক (পুত্র ও কন্যা) গ্রহণের আধিকার দিতে হবে।

২. নারী পুত্র বা কন্যা যেকোন সন্তানকে দত্তক গ্রহণ অধিকার দিতে হবে।

৩. প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর ক্ষেত্রে দত্তক গ্রহণ কালে কারো অনুমতির প্রয়োজন থাকবে না।

সার সংক্ষেপ:

গবেষণার সবগুলো অধ্যায়ের তথ্য থেকে একথা বলা যায়, বাংলাদেশের হিন্দু নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা খুবই নাজুক। আন্তর্জাতিক সনদ ও জাতীয় নীতির আলোকে তাদের মুক্তির পথ খুঁজতে হবে। এজন্য হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। হিন্দু বিবাহের ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় বিবাহের পাশাপাশি প্রতিটি বিবাহে নিবন্ধীকরণ করতে হবে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিবাহ বিচ্ছেদ ও অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ উভয়েরই অধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। বিধবা, অনুঢ়া (চিরকুমারী) বা স্বামী সাহায্যবিহীন নারীকে দত্তক (পুত্র ও কন্যা) গ্রহণের আধিকার দিতে হবে।

-০০০-

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থ ও তথ্যাবলী

১. কাশ্যপ; সুভাস সি, অনুবাদঃ পার্থ সরকার ১৯৯৬, আমাদের, সংবিধান ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট, ইন্ডিয়াঃ

২. বন্দ্যোপাধ্যায় অনিল কুমার ২০০৬, হিন্দু আইনঃ সাহারা প্রিন্টার্স, ইন্ডিয়া

৩. পাটোয়ারী এম. আই, ১৯৯৮, উত্তরাধিকারের সাধারন নীতিমালা, ঢাকা

৪. আজাদ হুমায়ুন, ১৯৯২ঃ নারী, ঢাকা।

৫. ধর নির্মলেন্দু, ১৯৯৭, হিন্দু আইনঃ রেমিসি পাবলিশার্স

৬. উল্লাহ সা'দাত, ২০০২, নারী অধিকার ও আইন, সময় প্রকাশন, ঢাকা

৭. আলম আনোয়ারা, ২০০০, নারী ও সমাজ, শৈলী প্রকাশনী

৮. শ্রীসুরাজি মোহন শাস্ত্রী, ১৯৯৮, হিন্দুর ধর্ম কথা, ঢাকা

৯. ঋষি মনু,-অনুবাদকঃ শ্রী মুরারী মোহন শাস্ত্রী; ২০০০ঃ মনু সংহিতা, দিপালী বুক হাউজ, ইন্ডিয়া

১০. মহাকবি বাল্মিকী কৃত, অনুবাদকঃ ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, ১৯৯৬, রামায়নম্,নিউলাইফ প্রকাশনী, ইন্ডিয়া

১১. মৌলিক গ্রন্থ, রচয়িতা ঐশ্বরীয় বানী, সংগৃহীত- মুনী ব্যসদেব, অনুবাদক- রমেশ চন্দ্র দত্ত, ১৯৯৬, বেদ, হরফ প্রকাশনী- কপি-৭

১২. ব্রহ্মচারী স্নেহময় ওব্রহ্মচারিনী সাধনা দেবী, ২০০২, অখন্ড সংহিতা, আযাচক আশ্রম, বারানসী

১৩. স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, ২০০৩, শ্রী শ্রী চন্ডী, ট্রায়ো প্রসেস, কলিকাতা

১৪. গান্ধী মহাত্মা, ২০০৩, হিন্দু ধর্ম ও সমাজ, নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা

১৫. যোগীরাজ বসু, ১৯৯৩, বেদের পরিচয়, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা

১৬. শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, বাং ১৩৩২, শ্রীমদ্ভগবত গীতা, কলিকাতা

১৭. বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ১৯৯৩, ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সহায়তা কমিটি, ঢাকা

১৮. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান, ২০০০, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৯. সুলতানা আবেদা, ১৯৯৮, ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকা-একটি বিশ্লেষণঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যারয় এম ফিল অভিসন্দর্প

২০. ইসলাম; মো, নুরুল, জুন-২০০৩,সমাজ সংস্কার ও নারীর ক্ষমতায়নে বেগম রোকেয়াঃ বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণঃ ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৭৬

২১. সুলতানা নাসরিন, ২০০১, উন্নয়ন, রাজনীতি ও নারী, অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব-বাংলাদেশ প্রেক্ষিতঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এম ফিল অভিসর্ন্দভ

২২. নাসরিন সুলতানা, ২০০১, উন্নয়ন, রাজনীতি নারী; অংশগ্রহণ ও অংশিদারিত্ব- বাংলাদেশ প্রেক্ষিত-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম ফিল অভিসন্দর্প

Dhaka University Institutional Repository

২৩. রেবা নার্গিস, ২০০৪, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম ফিল অভিসন্দর্প

২৪. নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য, ১৯৯২নারীর ক্ষমতায়ন উন্নয়ন প্রকৃয়ায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা, টাস্কফোর্স প্রতিবেদন, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী,

২৫. মালেকা বেগম, ১৯৯৬, আগষ্ট , নারীর চোখে বিশ্ব, (চতুর্থ নারী সম্মেলন) সাহিত্য প্রকাশ ।

২৬. নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা, বেইজিং প্লাটফরম ফর অ্যাকশন এর বাস্তবায়ন , মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৫

২৭. সমর গুপ্ত, বর্ষ সংখ্য ৪,১৯৯৮, পিতৃতন্ত্র, উন্নয়ন পদক্ষেপ , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী।

২৮. মন্ডল পরেশ চন্দ্র, ১৯৯৯ হিন্দু ধর্ম ও মহিলাদের নিরাপত্তাঃ বিবাহ ও উত্তরাধিকারঃ বাংলাদেশ

২৯. বারুরী ধীরেন্দ্র নাথ, ২০০৪, হিন্দু ধর্মে নারীঃ অপ্রকাশিত প্রবন্ধ,

৩০. পলাশ মন্ডল, ২১ ডিসেম্বর ১৯৯৯, হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, দৈনিক অর্থনীতি,

৩১. সানন্দাঃ ১৯৯৩, পৃ-৩১-৩২অক্টোবর

৩২. আইনের কথা, জুন, ২০০২, তৃতীয় সংস্করণ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র

৩৩. আয়শা খানম সম্পাদিত,২০০৪, নারীর প্রতি বৈষম্য দুরীকরণ কমিটির একত্রিশতম অধিবেশনওে সমাপনী মন্তব্য, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

৩৪. মহিলা ও শিশু বিযযক মন্ত্রণালয়, ১৯৯৭, উন্নয়ন নীতি জাতীয় নারী

৩৫. মানবাধিকার সার্বজনীন ঘোষণাপত্র, পৃ-১৫

৩৬. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন রিপোর্ট, বেইজিং, চীন, ৪-১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫

৩৭. ফাজরীন হুদা ওমোঃ অহিদুজ্জামান, ২০০১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্য ৬৯

38. *Obaidul Huq Choudhury's Hand Book of Muslim Family Laws "DLR 1997" (Section 5, Page 3 Fifth Edition)*

39. *Law and custom and statutory social reform the Hindu widows Remarriage Act of 1855—Lucy Carroll, Centre for South Asian Studies, University of Cambridge*

40. *Emerging Trends in sonship and adoption under Hindu law—Vijender Kumar, Nalsar Law Review, Vol-1, Number 1, Oct 2003*

41. *Palash Mondal, 24 September 1999, ÒIt's a bad and sad law,The Independent*

42. *Dr. Shahnaz Huda 1998 "Double Trouble: Hindu Women in Bangladesh—A Comparative Study" Journal of facalty of law, Dhaka University stuies, Part F, Volumn (Number 1, june- 1998)*

43. Ali Salma (BNWLA), 2000, An action study on proposed Reform of Hinu Family law

44. *M.Chen, Conceptual Model for Women's Empowerment, seminar paper, organized by The Save the Children USA*

Dhaka University Institutional Repository

সধবাদের কেইস স্ট্যাডি গ্রহণের চেকলিস্ট :

১. নামঃ

২. বয়সঃ

৩. স্বামীর নামঃ

৪. ঠিকানা (বর্তমান অবস্থান অনুযায়ী)

৫. নিজের ভাইবোনের সংখ্যাঃ ভাইঃ বোনঃ

৬. স্বামীর ভাই-বোন সংখ্যাঃ ভাই বোনঃ

৭. সন্তান সংখ্যাঃ ছেলেঃ মেয়েঃ

৮. আপনার বিবাহিত জীবনের বয়স কত?

৯. স্বামীর পরিবারের ধরন কেমন? ক) একক খ) যৌথ

বর্তমানে আপনি কি করছেন?

ক) গৃহকর্ম খ) চাকুরী গ) ব্যবসা

১০. আপনার পরিবারে ছেলে এবং মেয়ে হিসেবে ভাই-বোনকে আলাদাভাবে দেখা হয়েছে কিনা? (হ্যাঁ/না)

ক) শিক্ষা ক্ষেত্রে ভাই বেশি সুযোগ পেয়েছে?

খ) খাওয়া-দাওয়া ক্ষেত্রে ভাই বেশি সুযোগ পেয়েছে?

গ) চিকিৎসা ক্ষেত্রে ভাই অগ্রাধিকার পেয়েছে?

ঘ) আর্থিক ও চলাফেরার স্বাধীনতা ভাই বেশি পেয়েছে?

ঙ) পরিবারের কাজ-কর্ম ভাই বেশি করেছে?

চ) পারিবাবিক সিদ্ধান্তে ভাইয়ের গুরুত্ব বেশি?

ছ) পৈত্রিক সম্পত্তির সবটুকুই ভাই পেয়েছে?

Dhaka University Institutional Repository

১১. আপনি কি মনে করেন যে হিন্দু মেয়েদের অধিকার সংরক্ষণে বিবাহের রেজিস্ট্রেশন দরকার?

ক) দরকার আছে ☐ দরকার নাই ☐ জানিনা ☐

১২. হিন্দু বিবাহে অনেক রীতি আছে, এর মধ্যে এমন কোন রীতি আছে কি যেটি আপনার কাছে ভাল বা মন্দ লেগেছিল? সেগুলো কি?

ভাল লেগেছিল	মন্দ লেগেছিল
ক) খ) গ) ঘ)	ক) খ) গ) ঘ)

১৩. বিবাহের সময়ে আপনি কি দ্রব্য সামগ্রী উপঢৌকন ব্যতীত কোন স্থায়ী সম্পদ পেয়েছেন?

ক) হ্যাঁ ☐ খ) না ☐

১৩ক) উত্তর হ্যাঁ হলে সেই সম্পদগুলো কি?

☐

১৩খ) সেগুলো কে ব্যবহার করে?

নিজে ☐ স্বামী ☐ স্বামীর পরিবার ☐ অন্য কেউ ☐

১৩গ) যেসব সম্পদ পেয়েছিলেন তা আপনার আর্থিক উন্নয়নে সহায়ক বলে আপনি মনে করেন?

হ্যাঁ ☐ না ☐

১৪. একজন বিবাহিত মহিলা হিসেবে স্বামীর সংসারে নিজের আত্ম - মর্যাদা রক্ষার জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কি বলে আপনি মনে করেন?

ক) শিক্ষা ☐ খ) সম্পদ ☐ গ) চাকুরী ☐ ঘ) অন্য কিছু ☐

১৫. নিজের সন্তান হিসেবে পুত্র কন্যাকে কি আলাদা ভাবে মাঝে মাঝে তফাৎ করেন কি?

ক) শিক্ষা ক্ষেত্রে ছেলেকে বেশি সুযোগ দিচ্ছেন?

খ) খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে ছেলে বশি সুযোগ পাচ্ছে? ☐

গ) চিকিৎসা ক্ষেত্রে ছেলে অগ্রাধিকার পায়? ☐

ঘ) আর্থিক ও চলাফেরার স্বাধীনতা ছেলে বেশি পাচ্ছে? ☐

Dhaka University Institutional Repository

ঙ) পরিবারের কাজ-কর্ম ছেলে বেশি করেছে?

চ) পারিবারিক সিদ্ধান্তে ছেলের গুরুত্ব বেশি?

ছ) পৈত্রিক সম্পত্তির সবটুকুই ছেলেকে দেওয়া হবে?

১৬. হিন্দু বিবাহে উপঢৌকনের যে অঘোষিত (বাধ্যতামূলক) রীতি রয়েছে তা আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখেন?

ক) সঠিক মনে করি খ) সঠিক মনে করি না

* অবস্থানের পক্ষে যুক্তি:---

১৭. বিবাহের পরে হিন্দু মেয়েদের বাবা মায়ের মৃত্যুর পর তাদের আত্মিক কল্যাণে কার্য ছাড়া কোন দায়িত্ব আছে বলে কি আপনি মনে করেন?

ক) হ্যাঁ খ) না

১৮. বিয়ের পর বাবার বাড়ির বিষয়ে কি ধরনের দায়িত্ব পালন করছেন?

ক. অর্থনৈতিক সাহায্য,
খ. গৃহ পরিচালনার কাজে (বাজার করা, রান্নাবান্না করা, কেনাকাটা করা, বিল দেওয়া ইত্যাদি)
গ. ব্যাঙ্কের কাজে সাহায্য;
ঘ. বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্পত্তি দেখাশোনা করা,
ঙ. বাবা-মায়ের চিকিৎসা ও ভাইবোনের দায়িত্ব পালন

১৯. বিবাহের পরে বাবার বাড়িতে কন্যার কতটুকু আধিকার আছে বলে আপনি মনে করেন?

২০. সমাজে ছেলে-মেয়ের দায়িত্ব সমান উচিত বলে মনে করেন?

ক) হ্যাঁ খ) না

২১. সমাজে বাবা-মায়ের সম্পদে ছেলে-মেয়ের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

ক) হ্যাঁ খ) না

২২. মন্তব্য:

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ

Dhaka University Institutional Repository

----চেকলিস্ট----

১. বাংলাদেশে উত্তরাধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে যে বৈষম্য দেখা যায় তার প্রেক্ষাপট কি বলে আপনি জানেন?

২. আপনার মতে একজন হিন্দু নারী উত্তরাধিকার না থাকার জন্য কি কি সমস্যার মুখোমুখি হন ?

৩. পৈত্রিক ও স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার থাকলে হিন্দু নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থানের উন্নতি ঘটত -- আপনি কি মনে করেন?

৪. কেবলমাত্র ভোগস্বত্ব নয়, পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দু পারিবারিক আইনের পরিবর্তন প্রয়োজন আপনার মতামত কি ?

৫. হিন্দু নেতৃবৃন্দ মনে করেন বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে হিন্দু পারিবারিক আইন সংশোধনের উপযোগী নয় --- কেন ? এটাকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন।

৬. বাংলাদেশের প্রস্তাবিত ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড- কে আপনি কিভাবে দেখেন?

৭. আপনার মতে বাংলাদেশে কি কি হিন্দু আইনের পরিবর্তন হওয়া দরকার এবং কিভাবে তার পরিবর্তন করা সম্ভব বলে আপনি মনে করেন ?

Dhaka University Institutional Repository

বিধবাদের কেইস স্ট্যাডি গ্রহণের চেকলিস্ট :

১নামঃ

২ বয়সঃ

৩স্বামীর নামঃ

৪ ঠিকানা (বর্তমান অবস্থান অনুযায়ী)

৫. নিজের ভাইবোনের সংখ্যাঃ ভাইঃ বোনঃ

৬. স্বামীর ভাই-বোন সংখ্যাঃ ভাই বোনঃ

৭. সন্তান সংখ্যাঃ ছেলেঃ মেয়েঃ

৮. আপনার বৈধব্য জীবনের বয়স কত?

৯. বর্তমানে আপনি কোথায় থাকছেণ?

ক) মেয়ের কা খ) বাবার গ

১১. কিভাবে সংসার চালাচ্ছেন?

১২. বিবাহের সময়ে কোন স্ত্রীধন পেয়েছিলেন কিনা?

১৩. মন্তব্যঃ

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ